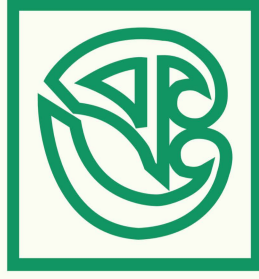




# স্বভাব ও সংযম

অরুণ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!  
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

# স্বভাব ও সংযম

প্রকাশকাল :

১৩ আগস্ট ২০০৯

২৭ শ্রাবণ ১৪১৬

প্রকাশক :

সজল কুমার দে

শহীদ কাদের সড়ক, খাগড়াছড়ি বাজার

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় :

তপন ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ :

সৌমিত্র ভট্টাচার্য্য

বস্ত্র :

গৌরব ভট্টাচার্য্য

কম্পোজ :

ইমেজক্লিক, চট্টগ্রাম

মুদ্রণে :

সোমাকো আর্ট প্রেস, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

চলচ্চিত্র বিনিময় : পঞ্চাশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :

জ্ঞান শিখা গ্রন্থালয়

১২ কে.এম. দাস লেন, ভোলানন্দ গিরি আশ্রম (মার্কেট), ঢাকা-১২০৩

ত্রিপুরা আর্ট হাউস, ২৯ হাজারী লেইন, চট্টগ্রাম

আদর্শ লাইব্রেরী/পার্বত্য লাইব্রেরী

খাগড়াছড়ি বাজার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

## উৎসর্গ

---

যাঁদের করুণায় এ জগতে এসেছি  
যাঁদের আশীর্বাদে  
আমার জীবন অগ্রসরমান  
প্রত্যক্ষ দেব-দেবী পিতা-মাতাকে  
আমার প্রণাম ।

— অধম সন্তান

## সূচিপত্র

---

ব্রহ্মচর্য কি- ৯

কেন ব্রহ্মচর্য পালন করবো- ১০

সুন্দর জীবনের জন্য ব্রহ্মচর্য- ১১

ব্রহ্মচর্য পালনে করণীয়- সত্যবাদিতা/স্বভাব/শালীনতা/বিশ্বস্ততা- ১৩-১৬

চলনে, বলনে, আচরণে- লোক ব্যবহার- ১৬-১৮

পরশীকাতরতা বা মাৎসর্য- ১৮-১৯

সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ- ১৯-২০

সুস্থ ও পবিত্র শরীর- ২১

শয্যাভ্যাগ- ২২

মল-মূত্র ভ্যাগ ও পরিচ্ছন্নতা- ২২

চোখ-মুখ ধৌতকরণ- মুখ, গলদেশ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা- জিহ্বা পরিষ্কার রাখা- ২৩-২৬

নাক পরিষ্কারকরণ, কর্ণপরিষ্কার করা- ২৬-২৮

চুল ও মাথা, লোম ও নখ- ২৮-২৯

সুস্থতার জন্য ব্যায়াম- ৩০-৩১

স্নান ও সাঁতার- ৩২

কৌপীন ব্যবহার- ৩৩

খাবার নিয়ম- খাদ্য ও অখাদ্য- কিছু খাবারের বিধি নিষেধ- ৩৪-৪১

শয়ন/বিশ্রাম- ৪২-৪৩

বীর্যক্ষয় ও তার প্রতিকার- ৪৪-৪৬

মানব ধর্ম- ৪৭-৫১

শেষ পর্যন্ত ভাল মানুষ- ৫২

স্বভাব জানা মানুষ চেনা- পুরুষ স্বভাব চরিত্র- নারী স্বভাব চরিত্র- ৫৩-৬০

জ্যোতিষ বিদ্যায় মানব চরিত্র ও বিয়েতে শুভাশুভ- ৬০-৬১

রাশি, নক্ষত্র, জন্মলগ্ন, কূটবিচার- ৬১-৭৫

বিয়ের প্রকার ও নিয়মনীতি, শাস্ত্রমতে বিয়ে নিষিদ্ধ, কন্যার শুভাশুভ লক্ষণ- ৭৬-৭৮

সুলক্ষণা সৌভাগ্যবতী নারী- ৭৮-৭৯

রামসীতার বিয়ে- ৭৯-৮০

# সূচনা

দুর্লভ মানব জীবন লাভের পর তার সার্থকতার জন্য চাই মনুষ্যত্ব লাভ। মনুষ্যত্ব লাভের নিমিত্তে শরীর ও মন এ দুটির দুর্বলতা ও অক্ষমতা দূর করে শক্তিশালী হতে হয়। শরীর স্থূল ও জড় এবং মন সূক্ষ্ম ও চেতনশীল। দেহ, মন, বুদ্ধিতে মানুষের “স্বরূপ” সীমিত নয়। স্বরূপকে চিনতে হবে এবং এতে লীন হতে হবে। এতেই পরমানন্দ। এতেই পরম সুখ।

শরীর সুস্থ ও সবল করার চেষ্টা করা সকলের দরকার। শরীর সুস্থভাবে গড়ে না ওঠলে দীর্ঘজীবন এবং জ্ঞানলাভে বাধা হয়। সবকিছুর মূলে শরীর। শরীর ভাল না থাকলে মনও ভাল থাকে না। জীবনে যা কিছু চাওয়া-পাওয়া সবকিছুর পূর্বে সুস্থতা প্রয়োজন। শরীর সুস্থ না থাকলে ভাল চিন্তা, সংযম সাধন, কোন কাজ, ব্যায়াম ও সেবা করা যায় না। স্নেহ-প্রীতি, ভালবাসা কোন কিছুই ভাল লাগে না। এমন কি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধন, আত্মীয়-স্বজন কাউকে সহ্য হয় না।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। জীবনের প্রতিটি স্তরে উন্নতির জন্য নিজ স্বাস্থ্য, চিন্তা-চেতনাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সবার আগে স্বাস্থ্য ও শক্তি চাই। ধ্রুবসত্য ঋষিবাক্য হচ্ছে—

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।” জ্ঞান, বিদ্যা, ব্যবসায় ও অর্থ সম্পদ অর্জনসহ যে কোন বিষয়ে পারদর্শিতা লাভে শরীরকে অবহেলা করলে ইঙ্গিত ফল লাভ হয় না। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে মানসিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। কৈশোর হতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের মাধ্যমে অগ্রসর হয়ে নিয়মানুবর্তিতায় গড়ে ওঠলে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য ও সমাজের জন্য সুন্দর, মার্জিত এবং অনুকরণীয় (Ideal) বিষয় হয়। সমগ্র জীবন সুখময়ের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যের আনন্দ যৌবনে, যৌবনের সুখ প্রৌঢ়ে, প্রৌঢ়ের সুখ বার্ধ্যাক্যে যাতে দুঃখের হেতু না হয় তাই শিক্ষা। যে শিক্ষায় ব্যক্তি জীবনে সুখ আনায়ন করে এবং সমাজ সুখী হয়, সমাজ সুখীর কারণে সমগ্র দেশ সুখে পরিপূর্ণ হয় তাই শিক্ষা। আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— “যাতে মানুষের অন্তরের পূর্ণতা বিকশিত হয় তা-ই শিক্ষা।”

স্বাস্থ্যচর্চায় নিজেকে কিশোর বয়স হতে নিযুক্ত করার প্রাথমিক বিষয়াদি এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। সুন্দর, চরিত্রবান মানুষ গড়ার লক্ষ্যে যে সব

উপকরণে ভিত্তি রচনা একান্ত প্রয়োজন তথ্যবিষয়াদির সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে। যে মূলভিত্তি (শৈশবকাল) হতে সুস্বভাব-সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে গড়ে ওঠে সে যথার্থই প্রাণবান, মননশীল ও বুদ্ধিমান হবে। একজন মানুষ চলনে, বলনে, আচরণে সত্যিকার মানুষ হলে যেমন সুন্দর আলোকিত মানুষ হয়; তেমনি সমাজ, দেশ ও তার দ্বারা উপকৃত হয়। এ আলোকিত মানুষটিই সমাজে সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের পূজারী হয়ে আলো ছড়ায়। মানব জীবন শুধু নিজের সুখের জন্য নয়, এ জীবনের দ্বারা যত অপরের সুখ-কল্যাণ করা যায় তবেই এ' জীবনের স্বার্থকতা।

ধনী বা দরিদ্র যে কেহ সুন্দর, সংযত জীবনযাপন করলে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ উপকৃত হয়, সমাজ সুশাসিত, স্বশাসিত হয়। চরিত্র গঠন আন্দোলনের জনক অখন্ড আর্দ্রশের মূর্তপ্রতীক শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ বলেছেন— “দরিদ্র হলে কেহ ছোট হয় না, চরিত্র যার সুন্দর, অন্তর যার শুদ্ধ, রুচি যার পবিত্র, চেষ্টা যার খলতা বর্জিত সে দরিদ্র হলেও ধনী, তার মত মহৎই বা কে আছে, সুন্দরই বা কে আছে।” মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার সময়ে যেসব আচার-আচরণ মনুষ্যত্ব অর্জনে সহায়ক তা কৈশোর হতে চর্চায় প্রত্যেককে শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

সংযম পালনের মাধ্যমে কৈশোর পার হয়ে যৌবনে উপনীত হলে প্রত্যেকে বিপরীত দেহের প্রেম, ভালবাসা পাবার আকুলতায় ব্যাকুল হয়। সংযমতায় যৌবন প্রতিপালনে নির্ধারিত বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তখন নিজে অথবা অভিভাবকগণ ছেলে বা মেয়ের সন্ধান করে বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হয়ে থাকে। একজন ছেলে বা মেয়ে তার জীবন সঙ্গী/সঙ্গীনিকে তার মতই স্বভাব-চরিত্রে পেতে বিশেষ আগ্রহী থাকে। এজন্য স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাইয়ে অগ্রসর হওয়া অধিকতর ভাল বিবেচনায় এ গ্রন্থে তথ্যবিষয়ে কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব তথ্য বিশ্লেষণ যে একশো ভাগ সত্য তা নয় এবং কাউকে প্রশংসা বা কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

জ্যোতিষবিদ্যা মতে, যে সময়ে মানুষের জন্ম, সে সময়ের ভিত্তিতে রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি গণনায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং মানুষের দৈহিক গঠনাকৃতির প্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত বেশিরভাগ ফলাফলের ভিত্তিতে তথ্য/ধারণায় প্রাপ্ত স্বভাব-চরিত্র বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। ঐ সব বর্ণনার সাথে কারো চরিত্রের হুবহু মিল হতে পারে— তা ভাল বা মন্দের দিকে। এজন্য প্রসন্ন হলেও, মনক্ষুণ্ণের কোন কারণ নেই। যেহেতু মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, অসীম শক্তির অধিকারী এবং মানুষের কর্মের মাধ্যমে তার ভাগ্য রচিত হয়। কর্মই ধর্ম, কর্মই সৌভাগ্যের জনক।

অনেক মণীষীর লেখা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক হয়েছে— এজন্য তথ্যসূত্রে উল্লেখিত গ্রন্থরাজীর গ্রন্থকার, প্রকাশক, সত্বাধিকারীর প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

স্বভাব, সৌন্দর্য ও সংযমের প্রতীক হিসেবে প্রচ্ছদে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র শ্রদ্ধাচিহ্নে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আমাদের অসীম সাহস, বল বৃদ্ধি করুক, স্বামীজীর আত্মানে বাংলার যুব সমাজ স্বদেশ ও বিশ্বের কল্যাণব্রতে নির্ভীক হৃদয়ে আত্মনিয়োগ করুক— এ প্রার্থনা করি।

অতিক্ষুদ্র প্রয়াসে মনের একান্ত চাহিদায় যদি কিশোর ও যুবদের সামান্যতম উপকারও হয় তবেই সার্থকতা। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশের পথ সুগম করতে খাগড়াছড়ির তদানিন্তন মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর মহোদয়ের সদয় সুদৃষ্টি আমাকে কৃতার্থ করেছে।

আজ বেশী বেশী মনে পড়ে— আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মিলন কান্তি বড়ুয়া, নবজ্যোতি খীসা, যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (মাননীয় সাংসদ), অনন্ত বিহারী খীসা, নবীন কুমার ত্রিপুরা, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমানসহ সকল শিক্ষাগুরুকে। যাঁদের অপার করুণায় লেখাপড়ার মধ্যে অমৃতসম এক মহা আনন্দ উপলব্ধি করে অসীম তৃপ্তি পাচ্ছি।

অপরিপক্ষ লেখাকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশের অসীম সাহস যাঁরা যুগিয়েছেন বিশ্বমানবতায় উজ্জীবিত সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী পরিতোষ চন্দ্র সাহা (রামগতি, লক্ষ্মীপুর), সহকারী ব্যবস্থাপক, আচার্য্য শ্রী মহানন্দ গোলদার (বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা) এবং বন্ধুপ্রতিম সতীর্থ জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (ডিসি অফিস, খাগড়াছড়ি— তাঁদের জানাই অশেষ ধন্যবাদ।

পরিশেষে— কামনা করি সকলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হোক, সমাজ সুন্দর হোক, মানবধর্মে সকলে উজ্জীবিত হোক, সকলে সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করুক।

— লেখক



আদর্শ জীবন গঠন করার  
প্রবল উৎসাহই উন্নতির মূল কারণ

# ব্রহ্মচর্য কি

ব্রহ্মচর্য মানে— 'সংযম'

বাক্ সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম,

আহার সংযম, লোভ-লালসা বর্জন ।

পোষাক-পরিচ্ছেদে সংযম,

আচার-আচরণে সংযম,

কু-অভ্যাস, কু-আলাপ, কুদৃশ্য বর্জন,

সদা সত্য কথা বলা, সৎ জীবন-যাপন করা

দেহের সারভূত তেজময় বীর্য

অহেতুক ক্ষয় না করা ।

একনিষ্ঠ মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ ।

এক কথায়—

যা কিছু মহৎ কল্যাণকর তা গ্রহণ করা

এবং যা খারাপ, অকল্যাণকর তা ত্যাগ করা ।

ব্রহ্মচর্য শব্দের প্রকৃত অর্থ

ব্রহ্মতে বিচরণ ।

যিনি ব্রহ্মে যুক্ত থাকেন,

তিনিই ব্রহ্মচারী ।

শাস্ত্র বলছে—

মরণং বিন্দু পাতেন

জীবনং বিন্দু ধারণাৎ ।

এ জন্য স্ত্রীচিন্তা ও

স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগই ব্রহ্মচর্য

এরূপ ধারণা প্রায় সকলের ।

# কেন ব্রহ্মচর্য পালন করবো

ব্রহ্মচর্য পালনে- দেহ সুগঠিত হয়, উৎসাহ বাড়ে ।

মেধা-তেজ, বল, বীর্য বৃদ্ধি পায় ।

উর্দীপনা ও পৌরুষের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটে ।

এক কথায়-

ব্রহ্মচর্য পালনে দেহ সুগঠিত হয়, মনের দৃঢ়তা ও

প্রাণে আনন্দ জন্মে ।

দেহ, মন, প্রাণ ভাল মানাই-

সুন্দর জ্যোতিষ্ময় এক মানুষ ।

যে এরূপ হতে চায়

তাকে অবশ্যই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে ।

# সুন্দর জীবনের জন্য ব্রহ্মচর্য

আমাদের এ সৌরজগতের মধ্যে সূর্যটা স্থির (আসলে স্থির নয়) আর সব গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে অনাদিকাল থেকে। এযাবৎ মনুষ্যের সন্ধান লাভকৃত অন্যান্য গ্রহের গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবী একটা। এ পৃথিবীতে গাছ-পালা, সাগর-নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, অজস্র রকমের জীব ও বিভিন্ন জড় পদার্থ বিদ্যমান। জীবকুলের মধ্যে মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টির সেরা, অশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন চালাক প্রাণী বলে আখ্যায়িত করেছে। আর তাই এ পৃথিবীর সবকিছুতেই মানুষের আধিপত্যে শাসন চলছে, চলবে। মানুষ নামের এ জীবটা নিজেকে জেনেছে এবং অপরকে জানার সুকৌশল খুঁজে বের করেছে—সেজন্য রচনা করেছে বিভিন্ন শাস্ত্রের। শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, বিভিন্ন কলা-কৌশল, জীবের উন্নতি-অবনতি এবং মহাবিশ্বের হরেক-রকমের অনেক অনেক তথ্য। সৌরজগতে অবস্থানরত সকল কিছুই ঘুরছে নিজ আবর্তে এবং সূর্যের চৌদিকে। সে সাথে সাথে পৃথিবীর মানুষগুলো দিবারাত্র ঘুরছে টাকা ও বিপরীত লিংগের পেছনে। অবোধ জীব সকল সারাদিন ঘুরে খাদ্য ও কাম তৃপ্তির আশায়। ঘূর্ণমানকাল অতিক্রমে ক্রমান্বয়ে জড় ও জীবকুলের এক সময় শেষ পরিণতি হয়।

এ পরিণতি সময়ের পর কি অবস্থা তা না ভেবে মানুষ যেই উপার্জনাক্ষম হলো 'ও বিপরীত লিংগের প্রেম, ভালবাসা পেল বা দিল সে থেকেই বিপরীত লিংগ (নারী বা পুরুষ) ও টাকা ছাড়া অন্য সব কিছু তার কাছে গৌণ হলো। নারী যখন পুরুষের সংস্পর্শে পেল প্রেম, ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং চাহিদার সবকিছু তখনই সেই নারী-পুরুষকে (তদ্রূপ পুরুষ নারীকে) কেন্দ্র করে ঘুরছে আর ঘুরছে প্রতিনিয়ত। এভাবে জীবনকে ঘূর্ণিচক্রে লাগিয়ে প্রেম, ভালবাসা আদান-প্রদান, ছেলে-মেয়ে উৎপাদন, চাহিদার সব চাওয়া-পাওয়া শেষ করে ক্রমান্বয়ে নিজেই একদিন শেষ পরিণতির দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। তখন আর জীবনের হিসাব-নিকাশের সময় থাকে না। শত চেষ্টা চলে। সেই মানুষটি 'এ' সংসারে যাদের বেশী আপন, বেশী ভালবাসা, বেশী সোহাগ, বেশী বিশ্বাস ও কাছে পেয়েছিল তারাও চেষ্টা করে, শত চেষ্টা। ক্রটি করে না কোন কিছুতেই, তবুও বিদায় নেয় সব আশা-মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসা ছিন্ত করে। মানুষসহ সব জীব এভাবে চলে যাচ্ছে শেষ পরিণতিতে। এ শেষ পরিণতি থেকে রক্ষার কোন পস্থা এখনো উদ্ঘাটন হয়নি।

মানুষের এ জীবনে বাঁচার যে সাধ তা থাকতো না যদি নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রেম, সোহাগ ভালবাসা না থাকত। প্রেম-ভালবাসা টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হলো অর্থ বা প্রাচুর্যতা। যার অর্থ-ধন সম্পদ নেই তার রূপ ধুয়ে খাবে নারী? না। তা যদিও কিছুদিনের জন্য সম্ভব হয়, তা কিন্তু স্থায়ী নয়। নারীর ভালবাসার জন্য তার চাহিদার সবকিছু দেবার সামর্থ্য ঐ পুরুষকেই অর্জন করতে হয়। নয়তো ভালবাসার একটা অংশ অপূর্ণ থাকে। সংসার নামক জালটা আরো বেশী প্যাঁচিয়ে যায়। নিজে নিজেকে ঐ আটকানো থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না কোন ক্রমেই।

পুরুষ ও নারীর এ ঘূর্ণিচক্রে যেমন- প্রেম, ভালবাসা ও টাকার প্রয়োজন তেমনি ভালবাসা, প্রেমকে স্থায়ীতে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন অটুট স্বাস্থ্য ও যৌবনের। এ স্বাস্থ্য যৌবন রক্ষা করার একমাত্র হাতিয়ার 'ব্রহ্মচর্য' পালন। জীবনে টাকা আয়ের সুকৌশল বা রাস্তা বের করতে জানে না এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। যে কোন প্রকারেই অর্থ লাভের পদ্ধতি মানুষ বের করে নেয়। এ পদ্ধতি দু'রকমের হতে পারে। যেমন- ন্যায় নীতিগতভাবে এবং অন্যায় অনীতিগতভাবে।

সে যাই হোক। নীতিগত বা অন্যায়ভাবে টাকা আয় করলেও ভালবাসা, প্রেম দেবার বা পাবার এবং সুস্বাস্থ্য অন্যায়ভাবে পাবার কোন সুযোগ নেই। এটা নিজ জীবনে আয়ত্ত্ব, অর্জন করে নিতে হয়। নিয়ম পালন করতে হয়। নিয়ম পালনের দ্বারাই স্বাস্থ্য সুদৃঢ়, সুন্দর ও শক্তিশালী হয় এবং দীর্ঘদিন ভালবাসা, প্রেম ধরে রাখা যায়। আমরা প্রায় সকলে পাঠ্যপুস্তকে 'চরিত্র' রচনা পড়েছি। আর, সাধারণত লোকে বলতে শুনি- ওর চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, ওর চরিত্র খারাপ ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রকৃত পক্ষে ছেলে-মেয়ের প্রেমের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয় না। প্রেম মানুষের জীবনে আসে- আসবেই। আর এ প্রেম হয় ছেলে ও মেয়ের সাথে।

মতপথ, বিষয়, শিক্ষা, পেশা, বয়স, দেশ-কাল, গোত্র সম্প্রদায় কিছুই এ প্রেমের বাধা হয় না, হতে পারে না। প্রেম আপন গতিতেই, যৌবনে প্রকাশিত হবেই। এ প্রেম পবিত্র-সুন্দর। যদি এ প্রেম সম্পর্ক স্বার্থ ও কাম জড়িত হয়, উশুংখল আচরণের পর্যায়ভূক্ত হয়, দৈহিক সম্পর্কের রূপ নেয় তবে তা দুঃচরিত্র। সাবধান হতে হবে যেন দুঃচরিত্রের না হই।

পবিত্র সুন্দর প্রেমময় জীবনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য চায় ব্রহ্মচর্য। এ ব্রহ্মচর্যের গুণে মানুষ আপনা-আপনি নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে। দেহ সুগঠিত হয়। জ্ঞান

লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন একান্ত প্রয়োজন। যতটুকু ব্রহ্মচর্য ততটুকু শক্তি, যতটুকু শক্তি ততটুকু সাহস। যতটুকু সাহস ততটুকু উন্নতি। জ্ঞান-শক্তি ও উন্নতির লক্ষ্যে ব্রহ্মচর্য মন্ত্রবৎ কার্যকরী। জ্ঞানবান ব্যক্তির দ্বারা সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়। বিদ্বান ব্যক্তিকে সকলে সম্মান করে। তাই ব্রহ্মচর্য পালনে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে শারিরীক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠার প্রাথমিক কিছু নিয়মাদি উল্লেখ করা হল।

## ব্রহ্মচর্য পালনে করণীয়

ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় জীবনের শুরু থেকে। নারী অথবা পুরুষ যেই হোক না কেন কিসে চরিত্র প্রস্ফুটিত হয় এবং কিসে চরিত্র নষ্ট হয় সে সম্পর্কে কয়েকটি ধাপ তথা সুন্দর জীবন-যাপন সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

**সত্যবাদিতা :** আমরা দৈনন্দিন যে সমস্ত কথা বলি তাকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায় (১) সত্য কথা [বাস্তব কথা] (২) মিথ্যা কথা [অবাস্তব কথা]। মানব শিশু মিথ্যা নিয়ে জন্মে না। এ দুনিয়ার আলো-বাতাসে বড় হয়ে বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরিবার প্রতিবেশী থেকেই মিথ্যা কথা বলতে শেখে। জন্মের পর শিশু কাঁদে। এ কান্না কেউ তাকে শিখিয়ে দেয় না। এটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। সত্য বলা (বাস্তব কথা) জন্মলব্ধ হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি এবং প্রতিবেশীদের 'কু' কর্ণমন্ত্রে সৎস্বভাব অসৎ রূপ ধারণ করে। মানুষ স্বার্থ/লোভ লালসার বশিভূত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এ মিথ্যা যাকে বলা হয় তার নিকট প্রথমে সত্য হিসেবে তা গৃহীত হয়। পরে সে যখন বাস্তব অভিজ্ঞতায় বা কার্যক্ষেত্রে, দেখে বা জানতে পারে যে ঐ কথাটি সত্য নয় তখন সে বুঝতে পারে বক্তা তাকে মিথ্যা বা অবাস্তব কথা বলেছিল।

কারো বলা কথা পরবর্তীতে প্রকৃত অসত্য রূপে ধরা পড়লে, তখন বুঝা যায় পূর্বের কথা মিথ্যা ছিল। এ মিথ্যা কথায় যে কাজগুলো হয়েছে বা যা ঘটে গেছে তাতে মিথ্যাবাদী লোকটার কিছু স্বার্থ সিদ্ধি হয়েছে বটে। আর যে মিথ্যার শিকার হয়েছিল সেও যখন বুঝতে পেরেছে যে, সে ঠকেছে তখন দ্রুত কিছু লাভের আশায় (কেউ কেউ) সেও মিথ্যার আশ্রয় নেয়া শুরু করে। এভাবে মিথ্যা বলাটা পরস্পরে আচার-আচরণে শেখে থাকে।

সৃষ্টিকর্তা সত্য। আমরা সেই সত্যের সন্তান। সত্যবাদিতা যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীর ভিত্তি। উচ্চপদ ও শ্রেণীর জন্য উত্তম কথন এবং সর্বদা সত্যবাদিতা স্বর্গীয় জ্ঞানের দিকচক্রবাল থেকে উদিত সূর্য সদৃশ। মুখশুদ্ধি (বাক্য শুদ্ধি) রাখার জন্য সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। সত্যযুগে মানুষের কথায় মিথ্যা ছিল না। বর্তমানে প্রায় সকলে সত্য ও মিথ্যার আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করে। তাই, কথার শুদ্ধি (বাক্য শুদ্ধি) নেই। সত্যবাদিতা যাবতীয় মানবীয় গুণাবলীর ভিত্তিস্বরূপ। সত্য ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে উন্নতি ও কৃতকার্যতা সম্ভব নয়। সত্য সর্বদা উত্তম। সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির মনে কোন দুর্বলতা থাকে না। সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরা ভয় পায়।

যারা মিথ্যা বলে তাদের আপাততঃ লাভ হলেও, পরবর্তীকালে মিথ্যার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে পরস্পর পরস্পরকে (বক্তা ও শ্রোতা) ভালভাবে বুঝে/জানে। স্বার্থের জন্য বা কোন কুচিন্তায় বা কু মতলবে কাউকে মিথ্যা বলা মহাপাপ। সর্বদা সত্য কথা বলা এবং শুভ ইচ্ছায় চলমান থাকা সমগ্র মানব জাতির সাথে সুসম্পর্কের প্রতীক স্বরূপ।

যারা প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলে তারা মিথ্যুক বা মিথ্যেবাদী হিসেবে অন্যের কাছে তথা সমাজে পরিচিত। একটি সামান্য মিথ্যা কথার দ্বারা অন্যের জীবন হানিও ঘটতে পারে। হতে পারে বিরাট দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়। যে মিথ্যা বলে সে ছাড়া অন্যে প্রথমে জানে না যে ঐ কথাটি মিথ্যা। ঐ মিথ্যায় অন্যে ঠকে, অন্যের ক্ষতি হয়। যে বলে সে সমাজে ঘৃণ্য ও মিথ্যুক হিসেবে পরিচিত হয়।

স্রষ্টা মানুষকে সব সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের মধ্যে জিহ্বা ইন্দ্রিয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিপাটি দু'মাড়ি দাঁতের মাঝখানে জিহ্বাটি চর্বণ, পেয় ও কথা বলার কাজ সুকৌশলে করে থাকে। কোন লোকের জিহ্বা না থাকলে সে ভালভাবে চর্বণ করতে, গিলতে ও কথা বলতে পারবে না। মিথ্যা কী সত্য কোন কথা বলতে এবং কোন খাবারও খেতে পারবে না। স্রষ্টা আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ শরীর দিয়েছেন। এ পূর্ণাঙ্গ শরীরের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ জিহ্বাকে প্রতিনিয়ত মিথ্যা বলতে ব্যবহার করলে অন্যের কত ক্ষতিসাধন করা হয় তা ভাবা দরকার। এটাও খুব সুস্বভাবে ভাবা দরকার যে, স্রষ্টা আমাকে একটা হাত না দিয়ে অথবা দুটো চোখ না দিয়ে বা জিহ্বাটা ছোট অথবা অধিক বড় করে দিয়ে জন্ম দিলে অথবা যদি কানে না শুনতাম তখন কি রকম হতো? অথচ এখন আমার সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুন্দরভাবে আছে তারপরও আমরা এগুলোর যথাযথ ব্যবহার না করে তাকে কুভাবে ব্যবহার করছি।

একবারও চিন্তা করা হয় না— যে আমাদের জন্ম মৃত্যুর ধারক তাঁর নির্দেশে যদি কোন এক সময় জিহ্বায় জড়তা এসে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন মিথ্যা দূরে থাক, সত্য বলতে চাইলেও তো বলা যাবে না। অথচ, মানুষ অহরহ এহেন অঙ্গ ‘জিহ্বা’ কে মিথ্যা বলতে ব্যবহার করে থাকে। আমরা সত্যের সন্তান। অমৃতস্যা পুত্রাঃ। সৃষ্টা চান আমরা সর্বদা সত্যবাদী হই। সত্যই হল সমস্ত গুণের বুনিয়াদ। সত্য দিয়ে জীবনকে সুন্দর ও দৃঢ় করতে হবে। সত্য বলার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়ে, সকল ‘বদ’ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে হবে। সত্যবাদিতা ছাড়া বিশ্বের কোন মানুষের পক্ষে প্রকৃত উন্নতি ও কৃতকার্যতা সম্ভব নয়। যখন কোন ব্যক্তির মধ্যে সত্যবাদীতার পবিত্র বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যাবতীয় স্বর্গীয় গুণাবলী তার মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে।

**স্বভাব :** যে সমস্ত লোক কাম ও অনৈতিক প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, তারা বিপদগামী এবং লম্পট হয়। শেষ পর্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র জীবন-যাপন, শৈল্পিক ও সাহিত্যিক বৃত্তির চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ সৎ স্বভাব-মানুষের কামভাব ও দুষিত প্রবৃত্তিসমূহ প্রশমিত করতে সদা সতর্ক দৃষ্টি, চপল স্বভাব, নগণ্য বস্তুর প্রতি অত্যাধিক অনুরক্তি এবং সর্বদা ভ্রান্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। সৎ প্রবৃত্তি— চিত্র, শিল্প ও সাহিত্যে বেশ্যাবৃত্তি, নগ্নতার অনুশীলন, বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে ব্যভিচার, সর্বপ্রকারের বিশৃংখলা, উগ্র স্বভাব, সস্তা ঘনিষ্ঠতা এবং যৌন দোষের তীব্র নিন্দা করে।

মহান বাহাউল্লাহ বলেছেন— সৎ চরিত্র ও ন্যায় স্বভাবের তরবারী লৌহ নির্মিত তরবারীর চাইতে অধিকতর তীক্ষ্ণ। যেহেতু এসব লোক নিজেদেরকে বিশ্ব পূর্ণগঠনের কাজে নিয়োজিত করেছেন। সুতরাং তাদের জন্য ধ্বংসকর অস্ত্র-শস্ত্রের আবশ্যকতা নেই। চরিত্র গঠন আন্দোলনের মহান সৃষ্টা শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বলেছেন— “যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য ততটুকু বল, যতটুকু বল ততটুকু সাহস, যতটুকু সাহস ততটুকু সফলতা, যতটুকু সফলতা ততটুকু অগ্রগতি। একটি দিনের ব্রহ্মচর্য্যও কিছু না কিছু বল দান করে এবং দীর্ঘকালের ব্রহ্মচর্য্য অমিয় শক্তির উৎস হয়।” সুতরাং আমাদেরকে স্বভাবে উন্নত হতে হবে। ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হবে।

**শালিনতা :** ক্রমবর্ধমান সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই সমগ্র মানবকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পশুর ন্যায় আচরণ মানুষের জন্য অসম্মানজনক। মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি বা যে কোন প্রাণীর প্রতি অসহিষ্ণু, অপ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার মোটেও উচিত নয়।



পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পর পরস্পরে সহিষ্ণু, প্রীতিময়, দয়র্দ্রতাপূর্ণ ব্যবহার করবে এটাই মানুষের একান্ত কর্তব্য। কথায়, কাজে, আচার-আচরণে কারো প্রতি অমর্যাদা, অশালিন, অসুন্দর ব্যবহার অসহনীয়। মানুষে মানুষে তো বটেই, তাছাড়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর প্রতি মানুষের শালিনতাপূর্ণ, সুন্দর, সহিষ্ণু আচরণ ও ব্যবহার একান্ত দরকার।

**বিশ্বস্ততা :** বিড়ালকে মাছ পাহারায় নিযুক্ত করা যায় না। পশু চুরি করে না। এরা খাদ্য সামনে পেলেই খায়। মানুষ চুরি করে, মানুষ মিথ্যা কথা বলে। এক মানুষ অন্য মানুষের নিকট সদা-সর্বদা অবিশ্বাসের বেড়াজালে আবদ্ধ। অথচ, আমরা যারা মানুষ বলে দাবি করি এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার সময় আমার/আমাদের বলে কিছু ছিল না। এত বড় দেহও ছিল না। গায়ে এখন কত সুন্দর পোষাক, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার্য তখন কি (জন্মের সময়) এগুলি কিছুই ছিল? না। আমরা নেংটা ক্ষুদ্র দেহ নিয়ে জন্ম নিয়েছি। পৃথিবী, না মঙ্গলগ্রহে আসলাম তখন কিছুই আমাদের জানা ছিল না। কে কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে, কে খাওয়াবে, কোথায় কার কাছে থাকবো, কাপড়-চোপড় কোথায় পাব, খাবার কে দেবে ইত্যাদি ইত্যাদি জীবনের কোন চিন্তা আমাদের কারো ছিল না। আস্তে আস্তে বড় হতে হতে আমাদের লোভ-লালসা বৃদ্ধি পায়। লোভের কারণে একে অন্যকে বিশ্বাস করতে ভয় পায়। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে না সে বিশ্বস্তও নয়, সত্যবাদীও নয়। যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয় তারা যে কোন দুষ্কর্ম করতে পারে। আমাদের বিশ্বস্ত হতে হবে সকল মানুষ তথা সকল প্রাণীর নিকট। বিশ্বাসঘাতকতা বড় পাপ। যত বড় সম্পদ হোক তার প্রতি লোভ না রেখে বিশ্বস্ত হতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে আমানতকারীর আমানত একশোভাগ রক্ষা করতে হবে।

## চলনে, বলনে, আচরণে— লোক ব্যবহার

এ পৃথিবীর সব মানুষের সাথে পরিচয়, মার্জিত ব্যবহার এবং প্রত্যেকের সহচর্যে আসা এক উত্তম চরিত্রগুণ। মানুষকে হিংসাতো অবশ্যই নয়, এমন কি যে কোন প্রাণীর সাথেও হিংসাত্মক, রুষ্ট, বদমেজাজে, রাগত্বেরে ব্যবহার উচিত নয়। অধীনস্থ হোক বা উচ্চপদস্থ হোক অমার্জিত ব্যবহার, ঔদ্ধত্যতা মোটেও ঠিক নয়। ঔদ্ধত্যতায় মানুষ-মানুষ থাকে না, তখন মানুষ পশুতে রূপ নেয়। যতই শিক্ষিত বা ধার্মিক বলে

দাবী করুক যদি অমার্জিত অশালিন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারকারী হয়, তবে সে এটাই প্রমাণ করে- তার সুশিক্ষা লাভ হয়নি, হীনবংশে জন্ম এবং মধুর ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার সম্পর্কে সে অজ্ঞ। শুধু সে একাডেমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট লাভ করেছে কিন্তু মনুষ্যত্ব বলে কিছু তার অর্জিত হয়নি।

একজন মানুষ যত বড় বিদ্বান বা ধার্মিক হোন না কেন যদি তিনি লোকের সাথে মমতাপূর্ণ, মধুর ও ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার না করেন তবে তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, ভালোবাসে না। জীবন চলার পথে সকলের সাথে এমন ব্যবহার করতে হবে যেন কেউ পর নয় এবং কেউ পর ভাবতে না পারে। বয়স্ক ও গুরুজনদের সাথে শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। সবার সাথে মমতাময়, স্নেহপূর্ণ মধুর ব্যবহার করতে হবে। এতে কোন সংকীর্ণতা মনে স্থান না দিয়ে বন্ধুবৎ ব্যবহার করা কর্তব্য। কাজের মাপে বা পদে (পদবী) কেউ বড় হয় না। উদারতাকে হৃদয়ে স্থান দিতে না পারলে, সে বড় মাপের মানুষ নয়। প্রতিনিয়ত চলাফেরা, কথাবলা, ওঠা-বসা ইত্যাদিতে মার্জিত রুচির পরিচয় প্রকাশে নম্র, ভদ্রভাবে জীবনযাপন অপরিহার্য। কারো সাথে কথা বলতে অহেতুক হাত, পা নাড়াচাড়া, চোঁচিয়ে বলা, অর্থহীন অনাবশ্যক শব্দ (মানে, বুঝলেন, ইসে, কথার কথার, আপনার ইত্যাদি) বলা কুঅভ্যাস ও অত্যন্ত অভদ্রতা।

শরীর দোলায়ে, পা দোলাতে দোলাতে, কুঁজো হয়ে বসে অশালীন শব্দ প্রয়োগে কথা বলা বা আলাপ করা অভদ্রতা ও কুরুচির পরিচায়ক। নির্ধারিত বিষয়ে গোছালোভাবে কথা বলাই উত্তম। অযথা বেশী কথা বলা বা একটি বিষয়ে অহেতুক কথা বাড়িয়ে বারবার রঙ্গরসে হাসি-তামসা করে, কারো নামে কুৎসা রটায়ে কথা বলা, সমালোচনা করা বা কোন আলোচনায় অংশগ্রহণ করা মোটেও উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা বাচালতা স্বরূপ। বাক্ সংযম করতে হবে। বাক্ সংযমের ফলে কোন কথার রেশ ধরে ঝগড়া-ঝাটি হবার সম্ভাবনা থাকে না। অহেতুক কথা বলা মানে বাচালতা, অভদ্রতা, শিষ্টতাহীনী এবং সময়ের অপচয়।

বাজে কথা বলা হতে নিজেকে কঠোর সংযমতায় রক্ষা করতে হবে। বাক্ সংযমের অশেষ গুণ। অন্যান্য কাজ ছাড়াও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমেও ক্রমশঃ আয়ু ক্ষয় হয়। কথা যদি বেশী বলা হয়- তখন শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয় বলেই আয়ুও ক্ষয় হয়। কোন বাচাল লোকের সাথে কোন ভদ্র-শান্ত-শিষ্ট লোক কথা বলতেও ভয় পায়। প্রথম প্রথম অভ্যাসে কথাবার্তা সংযমে আনা খুবই কষ্টকর। অভ্যাস করলে

কথায় সংযম হয়ে যাবে। সুন্দর শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগে মনের ভাব অন্যের নিকট উপস্থাপনের কৌশল আয়ত্ব হবে। সংযম সহযোগে বলতে বলতে এটি রপ্ত করতে হয়।

প্রাঞ্জল ভাষায়, শ্রুতিমধুর, সংক্ষিপ্তভাবে, মূল কথায়, ফাজলামি বর্জিত, স্পষ্টভাবে সত্যাপ্রিত কথা বলাও একটা আর্ট। কখনো পরনিন্দা প্রকাশ পায় এরূপ কথা না বলাই শ্রেয়। কথার দ্বারা কারো মনে ব্যথা দেয়া এবং কথার কারণে অন্যের বর্তমান, ভবিষ্যৎ অনিষ্ট বা ক্ষতি হয় বা সম্মানহানী হয় এরূপ কোন কথা বলা উচিত নয়। জীবনে কথায় ও কাজে এক হতে হবে। সকলকে স্মরণ রাখতে হবে— বলায় পটু কাজে কম, নিজেই হয় নিজের যম।

শাস্ত্র বলছে— পৃথিবীর উন্নতি পবিত্র ও ভাল কর্মের ভিতর দিয়ে এবং প্রশংসনীয় ও যথাযথ আচরণের মাধ্যমে সাধিত হতে পারে। কর্মই ভূষণ হোক, বাক্যে নহে। বাক্য শ্রুতিমধুর হোক। মার্জিত হোক।

## পরশ্রীকাতরতা বা মাৎসর্য

পরশ্রীকাতরতা খুবই বাজে প্রবৃত্তি। অপরের উন্নতি দেখে মনে মনে দুঃখে কাতর হওয়া বা হিংসা জাগ্রত হবার নাম— পরশ্রীকাতরতা। যাকে দেখে হিংসায় অঙ্গে জ্বালা ধরে তার কিছু হয় না, যে হিংসুক তার স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, আত্মিক-পরমাত্মিক সবদিকে ক্ষতি ও অবনতি হয়। পরশ্রীকাতরতার মত পরনিন্দাও অত্যন্ত খারাপ। কোন বিষয়ে অপরকে নিন্দা করার পূর্বে ভাবতে হবে— যে বিষয়ে নিন্দা করা হচ্ছে, সে রূপ কাজ, ঘটনা কালের পরিণামে বা যে কোন কারণে নির্মম পরিহাসে হয়ত নিজের ওপরও ঘটতে পারে। তাই, অপরের নিন্দা করা উচিত নয়।

হৃদয়ের সংকীর্ণতা থেকে পরশ্রীকাতরতার বা মাৎসর্যের জন্ম হয়। সিংহ আলোয় চাঁদ পৃথিবীকে আলোকিত করে কিন্তু ঈষা পরায়ণ ব্যক্তি এসব (সিংহ আলো) দেখে না, দেখে চাঁদের কলংক। কুসুমে শুধু কীট দেখে। ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ তার পছন্দ নয়, সে শুধু কাটার দোষ দেখে। অন্য কিছু সে দেখে না। আর কিছু সে ভাবতে পারে না। যে পরের ভাল সহ্য করতে পারে না, তারতো ভাল হবার শক্তি নেই।

## সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ

যাতে করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সৃষ্টি জীব স্ব-স্ব স্বকীয়তায় সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারে এবং নির্বিধায় জীবন-যাপন করতে পারে, এজন্য অমানবীয় কোন ধ্যান, চিন্তা মানুষের মধ্যে যেন জাগরিত না হয় তৎজন্য প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকর্তার স্মরণ, মনন করা কর্তব্য। যে, যে নামেই সৃষ্টিকর্তাকে ডাকুক ঐ নাম প্রতিনিয়ত জপতে হবে। চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে সৃষ্টির রহস্য। ভালবাসতে হবে সকল সৃষ্টিকে নিজের মত করে।

স্বভাব ও সংযম- ১৯

আল্লাহ, ভগবান, খোদা, পরা, তরা, কুই, গড, জং, গং, ঈশ্বর, অর্থাৎ যে নাম দিয়ে স্রষ্টাকে ডাকা হোক)। ডাকায় একাগ্রতা থাকতে হবে। এ নাম জপে অনন্ত শক্তি মেলে। সর্বত্র সর্ববস্থায় স্রষ্টার নাম জপা যায়। স্রষ্টাকে যে নামে ডেকে জপ-ধ্যান শুরু করা হয়, সে নাম ত্যাগ করা যাবে না। শত বাঁধা আসলেও ত্যাগ নয়, পরিবর্তন নয়। সৃষ্টিকর্তার নাম জপ সম্পর্কে স্বামী স্বরূপানন্দ বলেছেন— “নামে নির্ভর করিও, দেখিও তমসাবৃত অমাবস্যার রাত্রিতেও তোমার জন্য পূর্ণিমার চাঁদ উঠিতেছে, মরুভূমির বুক চিরিয়া তোমার জন্য সুশীতল বারি নির্ঝর বাহিরিয়া আসিয়াছে।”

একস্থানে স্থিরভাবে বসে জপের সময় শরীরকে স্থির, বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক সমরেখায় স্থাপনে মেরুদণ্ড সরলভাবে রেখে নিজে বোঝা যায় অথচ অপরে শুনতে পায় না এমন শব্দ করে (শুধু জিহ্বা দিয়ে) জপ করতে হবে। প্রতিনিয়ত নাম জপের ফলে দুর্বল, চঞ্চল ও হীনবীর্যকারক কাম পলায়ন করে। নাম জপ ব্রহ্মচর্যের পরম সহায়ক। এ দেহকে সৃষ্টিকর্তার মন্দির / মসজিদ / গীজ্জা / কেয়াং ইত্যাদি ভেবে সর্বদায় তাঁর (স্রষ্টার) নাম জপ করে, ষড়রিপুর উর্দ্ধে থেকে মূল্যবোধ সম্পন্ন ‘মানুষ’ হতে হবে। সব সময় নাম জপ করতেই হবে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে, চলা-ফেরায়, কাজের সাথে সাথে, খাবার সময়, লেখায়-পড়ায় অর্থাৎ সবসময় সব কাজের মধ্যে দিয়ে মধুময় নামজপ চালাতে হবে। রাতে শয়্যায় গিয়ে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপতে হবে। জপতে জপতে এক সময় ঘুম আসবে। ঘুমের মধ্যে শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ চলবে। মনে মনে মনন করতে হবে। প্রতিদিন একই নাম জপতে জপতে, মনে প্রাণে একই নামে স্মরণে-মননে এমন এক শক্তি অন্তর্ভুক্ত হতে সৃষ্টি হবে, যে শক্তি বা আলোর প্রভাবে স্রষ্টার চির আনন্দঘন রসময় বিশালতা দৃষ্টিগোচর হবে। স্রষ্টার নাম জপ ব্যতীত এক মুহূর্তও বৃথা সময় নষ্ট করা যাবে না।

শ্রী স্নেহময় ব্রহ্মচারী লিখেছেন—

ধর্মকর্ম এক সাথে সদা চলে তার,  
কর্ম সাথে নাম করার অভ্যাস যার।

এ দেহ রক্ষার্থে শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন প্রতিনিয়ত, ঠিক তেমনি নামকে প্রতিনিয়ত জপতে হবে এবং এ দেহ মন্দিরকে পবিত্র রাখার চেষ্টা / ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেহ পবিত্র, নিরোগ, দীর্ঘজীবী রাখার জন্য ভোরে শয়্যাত্যাগ একান্ত অপরিহার্য।

## সুস্থ ও পবিত্র শরীর

মানুষ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করতে চাই। আয়ুর্বেদ বলছে— “ধন্যার্থ কামমোক্ষানাম আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।” ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এ চতুর্বর্গ লাভ করতে হলে সর্বতোভাবে আরোগ্য থাকতে হবে। কথায় আছে— শরীর ব্যাধি মন্দির। শরীর রোগগ্রস্থ হলে কোন কার্যই সাধিত হয় না। শরীর সুস্থ ও পবিত্র রাখার জন্য আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। অথচ এ ব্যাধিগ্রস্থ শরীর সম্পর্কে অনেকের অনেক অজানা। এমনও দেখা গেছে অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী লাভে স্বনামধন্য কিন্তু ব্যাধিগ্রস্থ শরীর সম্পর্কে কিছুই জানে না। সংসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার ইচ্ছা থাকলে সর্বাত্মে দৈহিক উন্নতি অবশ্যই দরকার। শরীরকে সুন্দর হুঁটপুঁট বলিষ্ঠ রাখার জন্য ঋষিপুরুষগণ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। নির্দেশিত নিয়ম সর্বরোগ প্রতিষেধক, সর্বদুঃখ বিনাশক। নিয়মাদি পালনে মেধাশক্তি, ধারণ শক্তি, প্রতিভা দৃঢ় ও বিকশিত হয়।

জন্মগ্রহণের পর ৭/৮ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েকে পিতা-মাতাগণ সর্বদা কাছে রেখে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন/লক্ষ্য রাখেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সংসারের কর্তব্য কর্মের চাপে বা ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে— এমন ধারণায় অনেকেই তেমনটি লক্ষ্য রাখেন না। সাধারণতঃ পিতা-মাতাগণ মনে করেন ছেলে-মেয়েরা এবার নিজে নিজে চলতে, খেলতে, খেতে ও পড়তে পারবে।

ছেলেমেয়েরা যতই বড় হয়, পিতামাতাগণ ততই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যান। ছেলে মেয়েদের বয়ঃবৃদ্ধিতে শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে লজ্জা লজ্জা ভাব তাদের ঘিরে ধরে। মেয়েরা এ ক্ষেত্রে আরো বেশী অগ্রগামী। শিশু থেকে কিশোর ও তৎপর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা নিজে নিজে স্নান, আহার বাহ্যত্যাগ ইত্যাদি কার্যাদি সম্পাদন করতে পারলেও তাদেরকে এসব দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যাদি সম্পাদনের সুষ্ঠু রীতিনীতি সম্পর্কে জানানো এবং অভ্যস্ত করানো একান্ত দরকার।

## শয্যা ত্যাগ

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—

Early to bed and early to rise  
makes a man healthy, wealthy and wise.

রাতে শীঘ্র ঘুমানো এবং প্রত্যুষ শয্যা ত্যাগ মানুষকে স্বাস্থ্যবান, ধনবান ও জ্ঞানবান করে। সূর্যোদয়ের একঘণ্টা পূর্বে শয্যা ত্যাগ করে ঠান্ডা পানিতে চক্ষুদ্বয় উত্তমরূপে ধৌত করা দরকার। রাতের শেষে যে ব্যক্তি নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তার বীর্ঘ্য সুরক্ষিত হয় না। প্রত্যুষে বায়ু অতি পবিত্র, নির্মল— এতে শরীর মন স্নিগ্ধ, সতেজ ও পবিত্র হয়। ভোরবেলায় শয্যা ত্যাগের জন্য ডাক্তার ও স্বাস্থ্যবিদগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

মহানবী (সাঃ) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) কে ওসীয়াত করেছেন—  
'তুমি সারারাত জেগে ইবাদত করো, তবুও ভোরবেলা জাগ্রত হয়ে অবশিষ্ট নামাজ পড়বে। ভোরের নামাজ ঐ সময় পড়ো যখন তারার আলো অবশিষ্ট থাকে।

## মলমূত্র ত্যাগ ও পরিচ্ছন্নতা

পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সকলে খাদ্যগ্রহণ করে। প্রাণীকুল ভুক্ত খাদ্যের সারবস্তু রক্ত হিসেবে ধারণ করে এবং বর্জ্যপদার্থ পায়খানা-পস্রাবে বের করে দেয়। পায়খানা-পস্রাবের এ কার্যক্রমকে দিবারাত্রির মধ্যে এক নির্দিষ্ট সময়ে আনাও সংযমের পর্যায়ভুক্ত। সকাল, দুপুর, বিকাল ও খাওয়ার পর যখন ইচ্ছা তখন পায়খানায় যাবার চেয়ে, ভোরে এবং সন্ধ্যায় পায়খানায় যাবার অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ভোরে শয্যা ত্যাগের পর পানি পান করলে কোষ্টকাঠিন্য দূর হয় এবং পায়খানায় যাবার অভ্যাস গড়ে ওঠে। যেখানে সেখানে, খোলা জায়গায়, রাস্তার পার্শ্বে, পানিতে, ফলবান বৃক্ষের নিচে মলমূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। মল-মূত্র ত্যাগের সময় কথা বলা, গান করা, পান করা, খাওয়া দোষণীয়। কেহ কেহ মল-মূত্র ত্যাগের সময় ধূমপান করে— যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই অপকারী। এতে শরীরে বিভিন্ন রোগ জন্মে এবং জীবনী শক্তি হ্রাস পায়। মল-মূত্র ত্যাগের সময় দুমাড়ীর দাঁত শক্তভাবে চেপে মুখ বন্ধ রাখলে দাঁত ভাল থাকে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। পস্রাবের পর হাত, পা

মুখ ভালভাবে ধুতে হবে এবং পায়খানার পর মাটি, ছাই ও সাবান দিয়ে হাত, পা, মুখ ভালভাবে ধুয়ে অতঃপর স্নান করতে হবে।

প্রত্যেক শাস্ত্রে— মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। অনেকে মল ত্যাগের পর শৌচকার্য করলেও মূত্র ত্যাগান্তে শৌচকার্য করে না। এতে শরীরে ও কাপড়ে পস্রাব লেগে শরীর ও কাপড় অপবিত্র, নোংড়া ও জীবাণুযুক্ত হয়। মল ত্যাগের পর যেমন শৌচ করতে হয় তেমনি মূত্রত্যাগের পরও সম্পূর্ণ পূং (অভ্যকোষসহ)/ স্ত্রী জননেন্দ্রীয় ভালভাবে পর্যাণ্ড পানি ঢেলে শৌচ করা প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে রোগমুক্ত জীবন। শরীরের দূষিত অনেক রোগ-জীবাণু মল ও মূত্রের সাথে বের হয়। তাই, মল-মূত্র ত্যাগের পর যদি ভালভাবে শৌচক্রিয়ায় পরিষ্কার করা না হয় এতে শরীর অপবিত্র এবং রোগ-জীবাণুতে চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় পায়ে চপ্পল বা জুতা দিয়ে মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস করতে হবে।

পস্রাবের পর ভালভাবে শৌচক্রিয়া এবং পায়খানার পর স্নানে শরীর রোগমুক্ত হতে সহায়তা করে, মন পবিত্র ও উন্নত হয়। দেহকে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের ক্ষেত্র মনে করলে, এ দেহকে অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখতে হবে।

**চোখ মুখ ধৌতকরণ :** শয্যাগ্রহণের পূর্বে ও শয্যাত্যাগের পর পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ঝাপটা দিয়ে চোখ ধুতে হবে। অতঃপর পর্যাণ্ড পরিমাণ পানি পান স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। তাছাড়া যখনই মুখ ধোয়া হয় তখনই পানি ঝাপটা দিয়ে চোখ ধোয়া ভাল। আমাদের পুরো দেহটাকে ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনার জন্য দুটি চোখ অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাতে চোখ ভাল থাকে এবং মরণোত্তর চক্ষুদান করা যায় তজ্জন্য ব্যবস্থা নেয়া দরকার। অতি গরম, অতি ঠান্ডা, অতি অল্প আলো ও অতিরিক্ত আলোতে লেখাপড়া— চোখের জন্য ক্ষতিকর।

ভোজনান্তে মুখ ধোয়ার সময় চোখও ভালভাবে ধোয়া কর্তব্য। দর্শন ইন্দ্রিয় চোখ খুবই স্পর্শকাতর নাজুক অঙ্গ। গ্রীষ্মকালে অতি রোদে কার্যবশতঃ বাইরে যেতে সানগ্লাস ব্যবহার করা দরকার। তবে অন্যের সানগ্লাস, রুমাল ইত্যাদি ব্যবহার উচিত নয়। প্রত্যহ স্নানের পূর্বে গায়ে তৈল মর্দনের সময় আগে দু'পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ তৈল দ্বারা পূর্ণ করে তারপর গায়ে তৈল মর্দন করলে চোখের বিশেষ উপকার হয়। এতে— দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয়, চোখ স্নিগ্ধ থাকে এবং চোখের কোন পীড়া হবার



আশঙ্কা থাকে না। চক্ষুরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যহ প্রভাতে শয্যা ত্যাগের পর সর্বপ্রথম মুখের ভিতর যত পানি ধরে তত পানি নিয়ে, মুখ বন্ধ করে চোখে খোলা রেখে কমপক্ষে ২০/২৫ বার পানি ঝাপটা দিয়ে ধুতে হবে। চোখ মুখ ধোয়ার সময় সব সময় পরিষ্কার পানি ব্যবহারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগ ছড়ানোর অন্যান্য মাধ্যমগুলোর মধ্যে পানি অন্যতম। তাই, খাওয়া বা ধোয়ার কাজে পরিষ্কার পানি ব্যবহার একান্ত দরকার। প্রত্যহ পাঁচ-ছয়বার চোখ-মুখ ধৌত করা উত্তম ফলদায়ক। চোখ মুছবার জন্য সর্বদা পরিষ্কার নরম কাপড় ব্যবহার করা উচিত। বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত চোখে কোন কিছু ব্যবহার করতে নেই। ভিটামিন 'এ' যুক্ত খাবার (শাকসব্জি, পাকাফল, দুধ, কচুশাক, কলিজা, মলা ও ঢেলা মাছ ইত্যাদি) গ্রহণের ফলে চোখ ভাল থাকে।

সুষম খাদ্য গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়। মুখ দিয়েই আমরা খাদ্য গ্রহণ করি। এ জন্য মুখ সর্বদা পরিষ্কার রাখা দরকার। মুখ মন্ডলের উপরে ও ভেতরে সমানভাবেই পরিষ্কার রাখা উচিত। কোন লোকের মুখ দর্শনে তার মনের অবস্থা আঁচ করা যায়। খাদ্য গ্রহণ ছাড়াও মুখে কথা বলা তথা ভাব প্রকাশ করা হয়।

**মুখ, গলদেশ ও দাঁতের পরিচ্ছন্নতা :** মুখের ভেতরে দু'পাটি দাঁত এত সুন্দর সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে যার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য চূর্ণ বিচূর্ণ করে গলার্দ্ধ করা হয়। দাঁত মুখের শ্রীবৃদ্ধি করে। প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠার পর এবং রাতে ঘুমানোর পূর্বে মিসওয়াক বা ব্রাশ দিয়ে বা ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে মেজে সহনীয় ঠান্ডা অথবা গরম পানি দিয়ে দাঁত, মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। দাঁতের পরিচ্ছন্নতা ও মিসওয়াক/ব্রাশ/মাজন ব্যবহার সম্পর্কে সকলের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ফুলখড়িচূর্ণ এক ছটাক, সুপারী চূর্ণ (কড়ায়ে ঈষৎ ভেজে চূর্ণ করা) এক ছটাক, লবণ এক ছটাক, ফিটকারী চূর্ণ আধ ছটাক, গুট ও মরিচ চূর্ণ আধ ছটাক এবং কর্পূর দশ রতি একত্রে ভালভাবে পেষণ ও মিশ্রিত করে নিলে উৎকৃষ্ট দন্ত মাজন প্রস্তুত হয়। তাছাড়া, নিম অথবা বাবলা প্রভৃতি গাছের ডাল কিছুক্ষণ চিবালে আঁশমুক্ত হয়ে নরম ব্রাশের ন্যায় হয়। ঐ গাছ চিবানো মুখস্থিত রস সংযোগে গাছের ডাল ব্রাশ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দাঁতের সবচেয়ে উপকারী ও কার্যকর হলো জালের মূল। দাঁতের ব্যথা, দাঁত নড়া, পাইরিয়া প্রভৃতি দোষ রোধের জন্য লবণ উত্তমরূপে পিশে ২/১ ফোটা সরিষার তৈল মিশিয়ে দাঁত মেজে গরম পানি দিয়ে কুলি করলে উত্তম ফল পাওয়া যায়।

সর্বজন স্বীকৃত যে, যাঁর দাঁত যত ভালো, নিরোগ ও পরিষ্কার সে ততই রোগমুক্ত। কথা ও হাসিতে পরিপাটি দাঁতের ভূমিকা অসীম। পরিষ্কার দাঁত হাসিতে যেন মুক্তা ঝড়ে। দাঁতের পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস শিশুকাল থেকেই করা উচিত। শিশুকাল থেকে শরীরের অন্যান্য অংশের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে দু'বেলা দাঁত মাজনের অভ্যাসও গড়ে তোলার চেষ্টা সকলেরই করা উচিত।

জালগাহের মূলের মিসওয়াক দিয়ে দাঁতের বাইরে, ভিতরের মাড়ি, তালু, জিহ্বা এবং কণ্ঠনালীর উপরিভাগে পরিষ্কার করা চলে। গলদেশে মিসওয়াক করলে ওয়াঃ ওয়াঃ করে বমি বমি ভাব হয়। ভোর বেলায় গলদেশে/কণ্ঠনালীতে মিসওয়াক করা উত্তম। এ সময় পাকস্থলী শূন্য থাকে। মিসওয়াকের সময় বমি বমি ভাব হলে পাকস্থলীতে চাপ পড়ে ও ফুসফুসের এক প্রকার ব্যায়াম হয়।

**জিহ্বা পরিষ্কার রাখা :** পৃথিবীতে যত ভাষা আছে তার উচ্চারণ মানবগণ জিহ্বার সাহায্যেই করে থাকে। জিহ্বা প্রধানতঃ দুটি কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য গ্রহণ ও ভাব প্রকাশ। দুপাটি দাঁতের মাঝখানে থেকে সর্তকাবেস্থায় নড়াচড়া করে জিহ্বা নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করে থাকে। স্বাদ গ্রহণ ছাড়াও জিহ্বা পরিপাক ক্রিয়ার অবস্থা পরিজ্ঞাপক এক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়। রোগ নির্ণয়ে এর অবদান অপরিসীম। রোগানুসারে জিহ্বার বর্ণ ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। জিহ্বার সংকেতগুলি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

এ জিহ্বার দ্বারা খাদ্য গ্রহণে দেহের উন্নতি ও ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ হয়। ভাল ও মন্দ এ দু'প্রকার ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জিহ্বাকে ব্যবহার করা যায়। তবে, মানুষের উচিত মন্দ ভাষা বা শ্রুতিকটু ভাষা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। তাই, নীতিবাক্য বলছে— “স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখবে।” “বিনা প্রয়োজনে বাক্য বলা উচিত নয়।” রসনার ক্ষণিক তৃপ্তি সাধনের জন্য অখাদ্য-কুখাদ্য দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণে লোলুপ হয়ে মোহাক্ষ মানুষ এ জিহ্বা ব্যবহার করে— যা মোটেও উচিত নয়। লোভনীয় খাদ্য দেখলেই তা খাবার জন্য উৎসুখ হতে হবে— এমন ঠিক নয়। খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করা দরকার। কথা বলতে ও খাদ্য গ্রহণে জিহ্বাকে সংযত রাখতে হবে।

নিয়মিত দাঁত মাজনের পর জিহ্বা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। জিহ্বা পরিষ্কারের জন্য দ্বাদশ আঙ্গুলী দীর্ঘ মসৃণ কাঠ, বাঁশ, রৌপ্য বা স্বর্ণ নির্মিত জিভছোলা ব্যবহার করা

যায়। জিহ্বা পরিষ্কারের ফলে মুখের বিরসা, শোথ-দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়, দাঁতের দৃঢ়তা ও রুচি জন্মে। সকালে মুখ ধোয়ার সময় মধ্যমা ও অনামিকা আঙ্গুলী দিয়ে জিহ্বার আগাগোড়া গল-গহ্বর পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

**নাক পরিষ্কারকরণ :** পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নাক স্রোত্রেণ্ড্রিয় ও প্রাণ বায়ু আকর্ষণ। নাক দিয়ে বায়ু গ্রহণে দেহ সচ্ছল থাকে। বায়ুতে বিভিন্ন গ্যাস, জলবিন্দু ও ধূলিকণা থাকে। বায়ুর সঙ্গে এগুলো দেহে প্রবেশের সময় নাসালোম গ্রন্থীতে বাঁধা প্রাপ্ত হয়। দৈনিক ৫/৬ বার পরিষ্কার পানি দিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা প্রয়োজন। মুখ ধোয়ার সময় নাক দিয়ে যতটা সম্ভব পানি টানা এবং ছাড়া খুবই ভাল। এতে সর্দিকাশি হয় না। তাছাড়া, মাথাব্যথা, সাইনোসাইটিস ও মাইগ্রেনে এটি খুব উপকারী। সাত্ত্বিক গন্ধ আঘ্রাণে নাক পবিত্র রাখতে হয়। নাকের ছিদ্রপথে লোম থাকে— যাকে নাসালোম বলে। অনেকে এ লোমগুলি কেটে বা তুলে ফেলে— যা খুবই খারাপ অভ্যাস। লোম বৃদ্ধি হয়ে নাসাপুটের বাইরে এলে সযত্নে কাচি দিয়ে কেটে ছোট করতে হবে। টেনে তোলা বা একেবারে ছোট করে কাটা অনুচিত।

নাকে অনেকে নস্যি ব্যবহার করে, এটা স্বাস্থ্যের জন্য শুভ নয়। তবে বাজারের নস্যি না দিয়ে একান্ত যারা অভ্যস্ত তারা প্রতিদিন স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র পরিধানান্তে খাঁটি গব্যঘৃত নাকে নস্যি হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসে শুচি আসে, মন পবিত্র ও প্রফুল্ল হয়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নাক মালিশ করা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাকের ডগা মালিশ করলে কিডনি সবল থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্র নাসাপুটে বায়ু প্রবাহের প্রকারকে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের উপায় হিসেবে উল্লেখ করেছে।

‘সোম শুক্র বুধে বাম  
হারে লঙ্কা জিতে রাম।’

অর্থাৎ প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে সোম, শুক্র ও বুধবারে বাম নাসাপুটে এবং অন্যান্য দিবসে ডান নাসাপুটে বায়ু জোরে বাহিত হলে সুখ। বিপরীতভাবে হলে দুঃখ হয়।

**কর্ণ পরিষ্কার করা :** কান শ্রবণেন্দ্রিয়। দেহের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে কান অন্যতম। মাথার দুপার্শ্বে দুটি কান যেমন মানব দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে তেমনি এ ইন্দ্রিয়দ্বয়ের মাধ্যমে অপরের ভাষা বুঝার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ সুবিধা হয়েছে। কান না থাকলে কি ভীষণ বিপদ হতো তা বলে শেষ করা যাবে না। বাল্যকাল থেকে

যদি কেউ কানে শুনতে না পায় তাহলে সে ভাষাজ্ঞান লাভ করতে না পেরে মুক ও বধিরের ন্যায় হয়। অন্যান্য তন্ত্রের ন্যায় কানও স্নায়ু দ্বারা অনুভূতি অনুভব করে।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্রটির কারণে স্বরযন্ত্রের বিকলাঙ্গতা ও মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে শিশু অবস্থা থেকে বধির/আংশিক বধির হলে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত্ব করতে পারে না, ফলে বোবা হিসাবে আখ্যায়িত হয়। মুক-বধিরতা প্রতিরোধের বা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা আজো পৃথিবীতে আবিষ্কার হয়নি। এ সমস্যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাবে কানে যে কোন উপায়ে রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। দিনে ৫/৬ বার মুখ ধোয়ার সময় কানের বাইরে আঙ্গুল দিয়ে পরিষ্কার করা দরকার। দেহের অন্যান্য অংগ প্রত্যঙ্গের ন্যায় প্রতিদিন কানের অংশের ব্যায়াম প্রয়োজন। হাত দিয়ে কান মালিশ করাই এ অঙ্গের ব্যায়াম। কানের সামনে পেছনে মালিশ করলে এবং কানের লতিসহ পুরো কান মোচড়ালে কান ইন্দ্রিয়ের ব্যায়াম সম্পূর্ণ হয়— এতে পাকস্থলী ভাল থাকে। কোন বস্তু দিয়ে কানের ভিতরে ছিদ্র পথ পরিষ্কার করা হতে বিরত থাকার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কানের ছিদ্র পথে কোন বস্তু ঢুকালে কানের পর্দা ফেটে যাবার আশংকা থাকে। অনেকে ছোট ছেলে-মেয়েদের দুষ্টামি/অপকর্মের জন্য জোড়ে কান মলে শাস্তি দেয়— যা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। এতে কানের ক্ষতি হবার অনেক সম্ভাবনা থাকে। কান মলে শাস্তি দেয়া থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে। কানে ব্যথা হলে বা কোন অসুবিধা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন কিছু দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। আমাদের দেশে কোন কোন মায়েরা ছোটদের কানে তেল দিয়ে সেফটিপিন ব্যবহারে কানের ময়লা পরিষ্কার করে থাকে। কানের ময়লা পরিষ্কারকরণ সম্পর্কে ডাক্তারগণ বলেন— আপনা আপনিই ময়লা কানের ছিদ্র মুখ পর্যন্ত আসে যা হাতের আঙ্গুলি দিয়ে পরিষ্কার করা যায়।

আমাদের কানের ছিদ্রটি ক্রমশঃ সরু হয়ে পর্দার দিকে নেমে গেছে। ছিদ্রের বাইরের দিকের ত্বকে বিশেষ ধরনের মাংসগ্রন্থি রয়েছে যা কর্ণমল তৈরী করে থাকে। কর্ণমল বাইরের ধুলাবালিকে ধরে রেখে কানের পর্দায় পৌঁছতে বাঁধা দেয়। কর্ণমল জমা হয়ে ধীরে ধীরে বাইরের দিকে চলে আসে— যা সহজে মুছে নেয়া যায়।

ছোট ছেলেমেয়েদের শ্রবণেন্দ্রিয় অত্যাধিক শব্দ সহ্য করতে পারে না। তাই এদের বাস, ট্রাকের হর্ণের শব্দ ও যে কোন বিকট শব্দ হতে দূরে রাখা ভাল। নয়তো বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সর্বদা সাত্ত্বিক শব্দ/কথা শ্রবণে কান পবিত্র রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পস্থা।' যেখানে কুকথা আলোচনা হবে সেখানে না যাওয়া, কানে যেন সৎ কথা ছাড়া অন্য কিছু শুনতে না পায় এরূপ ভাবে চলাফেরা করতে হবে। পরিনিদা, পরচর্চা কখনো কানে স্থান দিতে নেই, এতে চিত্ত মলিন হয়। কুবাক্য শ্রবণ হতে বিরত থাকা এবং গুণগাথা, নীতিবাক্য, সদালাপ শ্রবণ করা আবশ্যিক। যেখানে কুকথার আড্ডা চলে, যে কথা শ্রবণে কাম, ক্রোধ ও পরচর্চা বৃদ্ধি পায়, সে কথা শ্রবণ হতে দূরে থাকা এবং সেস্থান ত্যাগ করা কর্তব্য। সৎ, নীতি ও প্রশংসা সূচক আলাপ, রূপকথা, উপদেশ গল্প শ্রবণ করা ভাল।

**চুল ও মাথা :** মানব দেহের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাথা। সাধারণ কথায়, পুরো দেহটাকে সঠিক পথে চালনা করতে মাথার গুরুত্ব অপরিসীম। মাথা চিন্তা শক্তির আধার। মাথায় ভাল ও মন্দ দু'রূপ চিন্তা জন্মাতে পারে। ভাল ও মন্দ নির্ভর করে চিন্তার গতিশীলতার উপর।

মাথায় চুল নিয়ে সকলে জন্মগ্রহণ করে। মাতৃগর্ভে জাত চুল অনেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাটে। চুল মাথাকে গরম ও ঠান্ডা হতে রক্ষা করে। মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে চুলের ভূমিকা অসীম। চুল ও মাথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত দরকার। চুল অপরিষ্কার থাকলেই মাথাও অপরিষ্কার ও গন্ধ হয় এবং উকুন জন্মে।

চুল পরিষ্কার রাখার সাথে সাথে পরিচর্যা ও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। নিয়মিত একইরূপ তেল মাথায় ব্যবহার করা উচিত। স্নানের অন্ততঃ ১ ঘন্টা পূর্বে মাথায় ও সর্ব্বাস্থে তৈলভঙ্গ/তেল মাথা ভাল। চুলের গোড়ায় গোড়ায় যাতে তেল প্রবেশ করে সেরূপ তৈলভঙ্গে শীরোরোগ হয় না। তৈলা মাথলে কেশ কোমল, দীর্ঘ, ঘন, স্নিগ্ধ ও কালো হয়। ইন্দ্রিয় সকল সতেজ থাকে। সারা দেহে তেল মাথার ফলে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়, বল বৃদ্ধি পায়। পায়ের তলায় তেল মাথলে সুনিদ্রা, চক্ষুর উপকার, শ্রান্তি ও জড়তের নাশ হয়। তরুণ জ্বরে, অজীর্ণে এবং বমন হলে তৈলাভঙ্গ করা ক্ষতিকর। মাথার তালুতে তেল দেবার পূর্বে দু'পায়ের বন্ধাস্থলীর কোটরে তেল দিলে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। যখনই সম্ভব মাথা মালিশ করা ভাল। মাথা মালিশ করলে রক্ত চলাচল সহজ হয়, মগজ তথা স্নায়ুকেন্দ্র ভাল থাকে ও সহজে চুল পড়ে না এবং পাকে না। প্রতিদিন দশ মিনিট হাত ঘুরিয়ে ভেজা কপালে মালিশ করলে পিটুহটারি গ্রন্থি সতেজ থাকে।

## লোম ও নখ

যে সব জীবজন্তুর লোম ও নখ আছে তা প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি হয়। মানুষের বর্ধিত লোম ও নখ, তার নিজ ইচ্ছায় সময়ে সময়ে কর্তন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। নখ ও লোম কর্তনের কোন ব্যবস্থা মানুষ যদি না করত তবে পশু ও মানুষের পৃথক দেখা কষ্টকর হত। শরীরের কোন কোন স্থানে হরমোনের আধিক্য হেতু লোম বেশী বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন অঙ্গে আবার লোম কম হয়। যে অঙ্গের লোম বৃদ্ধি হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অসুবিধা এবং দেখতে অসুন্দর দেখায় সে অঙ্গের লোম কাচি দিয়ে কেটে ছোট করা দরকার। পুরুষের মুখে যে লোম বেড়ে উঠে তাকে শশ্রু বা দাঁড়ি বলে। দাঁড়ি মসৃণ করে না কেটে কাচি দিয়ে কেটে ছোট করে রাখা ভাল। অতি তীক্ষ্ণ ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে প্রতিদিন সেভ করা হলে চোখের পক্ষে তা অহিতকর। তাছাড়া, মুখে লোমকূপের গোড়ায় গোড়ায় একপ্রকার স্পোটক বর্ণ হয়। ছেলে ও মেয়েরা যৌবনে পদার্পণ করলে শরীরের পরিবর্তন হয়, ছেলেদের মুখে শশ্রু, গৌফ গজায়, বুক, বগলে ও জনদ্রিয়ার পার্শ্বে লোম গজায় ও বৃদ্ধি পায়। বগল এবং নাভির নীচে জনদ্রিয়ার পার্শ্বে লোম কেটে ফেলার কঠোর নির্দেশের অনেক উপকারিতা আছে। শরীরের এসব অংশ সর্বদা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে এবং হাত ও পায়ের সংযুক্ত স্থানে বেশী ঘাম বের হয়। ফলে, লোমের সাথে ঘাম জমে খুব দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ স্থানের লোম না কাটা হলে খোস-পাঁচড়া ও ফোঁড়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হবার আশংকা থাকে। লোম বেশী বড় হলে এবং ঐ স্থান অপরিষ্কার থাকলে সেখানে উকুন ও বিবিধ চর্মরোগ হয়। ডাক্তারগণ বলেন— গুণ্ডস্থানের লোম না কেটে বাড়তে দেয়া হলে যৌন শক্তির উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

চুল, গৌফ, দাঁড়ি ও গায়ের লোম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিপাটি রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। প্রত্যেক মানুষকে সুন্দর দেখানোর ক্ষেত্রে চুলের ভূমিকা অপরিসীম। লোমকূপের গোড়া অপরিষ্কার হলে ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে ঘাম বের হতে পারে না। এতে শরীরে বিভিন্ন রোগ জন্মায়। তাই চুল, গৌফ, দাঁড়ি ও গুণ্ডস্থানের লোম কেটে ছোট রাখা প্রয়োজন এবং এ সব স্থানে নিয়মিত তেল সাবান দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হয়।

বহুযুগ পূর্বে বিজ্ঞানের প্রসার যখন হয়নি, স্বাস্থ্য সম্পর্কে যখন আলো ছড়ায়নি তখনো ধর্মীয় দৃষ্টিতে লজ্জাস্থান, বগলের লোম ও চুল দাঁড়ি কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্পর্কে আলোকপাত করে হুশিয়ারী উদ্ভাষণ করা হয়েছে। প্রত্যহ স্নানের পূর্বে সরিষার তেল সারা শরীরে, গুণ্ডস্থানে, চুলে, দাঁড়িতে ভালভাবে মেখে কিছু

সময় পর পরিষ্কার পানিতে স্নান সারতে হবে। মাথার চুলকে ভালভাবে কছলিয়ে, হালকা টেনে চুলগুলোকে জাগিয়ে তোলে স্নান করা ভাল। এতে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। চুলের অকালপক্কতা, চুল ঝড়া রোধ হয়। মাঝে মধ্যে স্নানের আধঘন্টা পূর্বে লেবুর রস, মসুরডাল ভিজানো পানি চুলে মেখে স্নান করলে চুল উজ্জ্বল, মসৃণ ও ঝরঝরে হয়।

## সুস্থতার জন্য ব্যায়াম

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অন্যান্য নিয়ম মেনে চলার সাথে সাথে নিয়মিত ব্যায়াম করা ঔষধ স্বরূপ। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম শরীরকে নিরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী করে। ব্যায়াম সুস্থ দীর্ঘ জীবন লাভ করার একান্ত সহায়ক। এ উপমহাদেশে উদ্ভাবিত যোগ ব্যায়াম আজ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত অথচ আমরা অনেকে এ সম্পর্কে এখনো অজ্ঞাত। যোগ ব্যায়ামের উপর সুলিখিত বই পড়ে এবং সম্ভব হলে কোন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে সঠিক ধারণা নিয়ে ব্যায়াম করা যায়। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে শরীর সুস্থ, হৃদযন্ত্র, পাকস্থলী, যকৃত, প্লীহা ইত্যাদি সবল থাকে। মেরুদণ্ডের কাজ স্বাভাবিকভাবে সাধিত হয়, রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, পরিপাক প্রণালীর উন্নতি হয়, গ্রহণকৃত খাদ্যের সারাংশ দেহের বিভিন্ন অংশে নীত হয় এবং দেহস্থ অকেজো পদার্থ মল-মূত্র ও ঘর্ম শরীর হতে সহজে বের হয়ে যায়।

ব্যায়াম নানা প্রকার হতে পারে। যেমন—

১. খালি হাতে ব্যায়াম
২. যৌগিক ব্যায়াম
৩. ডাম্বেল নিয়ে ব্যায়াম
৪. বারবেল নিয়ে ব্যায়াম
৫. প্যারালাল বারে ব্যায়াম
৬. হেলান বারে (শ্লানটিং বার) ব্যায়াম
৭. রোমান রিং ব্যায়াম
৮. নীচু বারে ব্যায়াম
৯. হরিজন্টাল বারে ব্যায়াম ইত্যাদি।

নিয়মিত ব্যায়াম করলে যে কোন বয়সের যে কোন ব্যক্তি দীর্ঘদিন স্বাস্থ্য শক্তিতে অক্ষুন্ন থাকে। জীবনে উন্নতির জন্য দেহের সুস্থতা একান্ত প্রয়োজন। আর এ সুস্থতার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যায়াম শুধু দৈহিক নয়, মানসিক শক্তিও সুসংহত করে। ব্যায়ামের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। যার যখন সুবিধে, সে তখন ব্যায়াম করতে পারে। তবে, ভরাপেটে, মধ্যাহ্ন/নৈশ ভোজনের পর, ক্ষুধার সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পর ব্যায়াম অভ্যাস ক্ষতিকর। আমাদের দেশে সবচেয়ে ভাল সময় হচ্ছে ভোরবেলা সূর্য উঠার আগে বা সূর্য সবে মাত্র উঠেছে (এ সময় খালি পেটে ব্যায়াম করা যায়) এমন সময়ে অথবা সূর্যাস্তের অল্প পরে যখন বাতাস বেশ ঠাণ্ডা থাকে এ সময় ব্যায়াম খুব হিতকর।

হালকা ঢিলে-ঢালা পোষাকে, যতক্ষণ দেহে ক্লান্তি না আসে অর্থাৎ যতক্ষণ ব্যায়ামকারীর কাছে ব্যায়াম আরামদায়ক হবে, ততক্ষণ ব্যায়াম অভ্যাস করা যায়। ব্যায়ামের ৩০/৩৫ মিনিট পর স্নান করে (স্নানের পূর্বে তেল মর্দন ভাল) বা হাত-মুখ ধুয়ে ভিজ়ে গামছা দিয়ে গা মুছে নিতে হয়। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সহায়ক। শারীরিক স্বল্প ক্ষয় রোধের জন্য ব্যায়ামের ৫/৭ মিনিট পর গুড়, যবের ছাতু, লবণ ও লেবুর রস মেশানো শরবৎ পান করা ভাল।

ব্যায়ামকারীর ধৈর্য ও নিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। দশ বছর বয়স থেকে নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম অনুশীলন করা হলে সুস্থ, সবল, নিরোগ দেহের অধিকারী হওয়া সম্ভব। বয়সভেদে ব্যায়ামের প্রকারভেদ আছে। সপ্তাহে ৬ দিন ব্যায়াম করে ১ দিন ব্যায়াম বন্ধ রাখা উচিত। এতে ব্যায়ামের এক ঘঁয়েমি কেটে যায় এবং বিশ্রামের ফলে দ্রুত শারীরিক উন্নতি হয় ও পরের দিন ব্যায়াম করার জন্য আগ্রহ জন্মে।

উপযুক্ত শিক্ষক বা ব্যায়াম সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শরীর অনুযায়ী ব্যায়াম অনুশীলন করে ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সুস্থ সবল নিরোগ দেহের অধিকারী হতে পারে।

ব্যায়াম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এ ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। উৎসুক পাঠককে উপযুক্ত শিক্ষক ও সুলিখিত গ্রন্থের আশ্রয় নিতে হবে। ব্যায়াম সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল—

ক) ব্যায়াম শিক্ষা - আয়রনম্যান শ্রী নীলমণি দাশ

খ) ব্যায়াম ও স্বাস্থ্য - ঐ

গ) সচিত্র যোগ ব্যায়াম - ঐ



## স্নান ও সাঁতার

ব্রহ্মচর্যপালনকারীদের দৈনিক তিনবার স্নান কর্তব্য। তবে, শরীরে সহ্য না হলে অথবা শীতকালে দৈনিক দু'বার স্নান করা যায়। প্রাতঃস্নান (প্রাতঃস্নান সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্বে) ও সূর্যস্নান শরীরের জন্য খুবই উপকারী। স্নানের দ্বারা দেহের বহিরাংশে পরিষ্কার এবং সিন্ধতা হয়। স্নানের পূর্বে শরীরে তৈলাভ্যঙ্গ প্রয়োজন কিন্তু প্রাতঃস্নানকারীর পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ না হলেই চলে। প্রাতঃকালে ব্যায়াম অভ্যাসের পর শরীরে উত্তাপ এবং ক্লান্তি সৃষ্টি হয়। ব্যায়াম শেষ হবার কমপক্ষে ৩০ মিনিট পর স্নান করলে শরীরের ক্লান্তি দূর হয় এবং সতেজ অনুভব হয়।

ধর্মশাস্ত্রে পবিত্রতার প্রথম ধাপ হিসেবে স্নানকে উল্লেখ করা হয়েছে। দেহের বহিরাংশের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত স্নান করা একান্ত প্রয়োজন। দিবা-রাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে সময়ে, যারপক্ষে স্নান করা সহজ বা সুখকর সে মতে প্রতিদিন একই সময়ে স্নানাভ্যাস করা ভাল। অধিক রাত্রে ও দিন-দুপুরে স্নানের সময় স্থির না করাই উত্তম। পরিষ্কার নির্মল পানিতে স্নান প্রশস্ত। শাস্ত্রে-নদী ও সমুদ্রে স্নান করার প্রশংসা ও উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। বন্ধ পুকুরে/জলাশয়ে স্নান করার চেয়ে স্রোতস্বিনী নদীর নির্মল পানিতে স্নান অতি উত্তম। কথায় বলে—

“নদীর জল ঘোলা ভাল,  
জাতের মেয়ে কাল ভাল।”

তবে গবাদী পশু-পাখী স্নান করে, মলমূত্র ও ময়লামুক্ত অপরিষ্কার পানি হলেও নদীর পানি ভাল হবে এমন কথা নয়। প্রতিদিন লোমকুপ দিয়ে ঘামের সাথে বের হওয়া অনেক রোগ জীবাণু স্নানের ফলে ধৌত হয়ে শরীরকে নিরোগ রাখতে সহায়তা করে। এজন্য প্রতিদিন পরিষ্কার পানিতে ভালভাবে গা রগড়ায়ে স্নান করা দরকার। অতি শীত সহ্য না হলে কুসুম-কুসুম গরম পানিতে স্নান করতে হবে।

সমুদ্র, নদী, পুকুর বা ঝিলে স্নান-কালে পানিতে পা ডুবানোর পূর্বে মাথায় ভালভাবে পানি দিয়ে মাথা ভিজাতে হবে। অতঃপর পানিতে নেমে চোখ-মুখসহ সম্পূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালভাবে রগড়ায়ে স্নান সারতে হবে। ক্লান্ত শরীরে/উষ্ণ ঘামে ভেজা শরীরে হঠাৎ পানি ঢাললে বা পানিতে নেমে স্নান করলে শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস/বৃদ্ধি ঘটে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা বেশী। স্নানের সময় সাঁতার কাটা এক ভাল ব্যায়াম। সাঁতার সকলকে জানতে হবে। এতে করে জীবন চলার পথে কোন বিপদ হলে তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং গভীর পানি হতে কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

পরিচ্ছন্নতার জন্য স্নান। তাই, যে স্থানে স্নানঘর (Bathroom) সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করা বা দুর্গন্ধ হয় এমন কিছু করা মোটেও ঠিক নয়। স্নানের ক্ষেত্র বা স্নানঘর বা নদী, পুকুর, কুয়া, পানির কল যেখানেই স্নানের জন্য ঠিক করা হোক না কেন তা পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

যুবককালে কোন কোন সময় স্বপ্নদোষ হয় এতে শরীরে দুর্বলতা দেখা দেয়। স্বপ্নদোষ হলে স্নান করা দরকার। ফলে, শরীরের দুর্বলতা দূর হয়ে প্রশান্তি নেমে আসে।

স্নানের সময় শরীর ভালভাবে রগড়িয়ে পরিষ্কার করা হলে লোমকুপের গোড়ায় ময়লা জমতে পারে না এবং কোন চর্মরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানকালে চুল যতই ভালভাবে আঙ্গুল দিয়ে হালকা টানটান করে কচলিয়ে ধোঁয়া হয় ততই ভাল। এরফলে সহজে চুল পড়ে না, অকাল পক্কতা রোধ হয়।

মনে রাখতে হবে—

ক) ভোরে ঘুম থেকে উঠে মল-মূত্র ত্যাগের পর ব্যায়াম এবং ব্যায়াম শেষে আধঘন্টা বিশ্রামের পর স্নান করতে হবে।

খ) স্নানকালে নাভিমূলে প্রচুর শীতল পানির ধারা দিলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়।

গ) মলত্যাগের পর স্নান করলে শরীরে রোগ জন্মাতে পারে না। জীবনধারণে ৯০% ভাগ সুস্থতার নিশ্চয়তা থাকে।

## কৌপীন ব্যবহার

ল্যাস্কেট বা কৌপীন ব্যবহার করা প্রত্যেক পুরুষের উচিত। অভ্যাসকে নিচের দিকে দোলায়মান অবস্থায় এবং জনেন্দ্রিয়কে উর্দ্ধভাগে স্থাপিত করে সজোরে ল্যাস্কেট বা কৌপীন পরিধান করতে হয়। পরিধেয় ল্যাস্কেট বা কৌপীন দিবারাতে অন্ততঃ দু'বার পরিবর্তন করে ধুয়ে নিতে হবে। কৌপীন পরিধানে শুক্র দৃঢ় হয়। কামভাব সংযত হয়, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের অবশ্যই কৌপীন ব্যবহার করা উচিত। কৌপীন পরিধান করে কোন রূপ কুচিন্তা, কুরুচিপূর্ণ দর্শন এবং অশ্লীল কামউত্তেজক গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা পাঠ, আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ।

কৌপীন সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। অন্যের পরিধেয় কৌপীন ব্যবহার বা নিজের কৌপীন অন্যকে পরিধান করতে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বীর্য ক্ষয় তথা কামভাব থেকে বিরত থাকার সংকল্প করে এক মনে কৌপীন পরিধান করতে হবে।

## খাবার নিয়ম

ছোট বড় সকল প্রাণীই খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। রুচি অনুসারে সকল প্রাণীরই পরিমিত খাদ্য গ্রহণ আবশ্যিক। পশু-পাখী কীট-পতঙ্গের সময় জ্ঞান নেই। মানুষের জ্ঞানের সাথে তাদের তুলনা হয় না। পশু-পাখী-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীরা যেখানে যখন যা পায় তখন তা খায় কিন্তু মানুষের খাবার নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে সম্পন্ন হওয়া ভাল। যখন তখন, যেখানে-সেখানে, খোলা বাসি খাবার, অপরিষ্কার হাত-মুখে খাওয়া উচিত নয়।

সকালে, দুপুরে, বিকালে ও রাতে যখনই খাবার সময় হয়, তখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ভালভাবে হাত-মুখ ধুয়ে দুর্গন্ধবিহীন পরিবেশে শুষ্কস্থানে, শুদ্ধচিত্তে, উৎকর্ষাবিহীনভাবে সস্থির বসে ধীরে ধীরে নিরবে ভালভাবে চিবিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা উত্তম। খাদ্য যতই চর্বণ হয় ততই তা স্বাস্থ্যের জন্য সুখকর। ভালভাবে চর্বণ না করে খেলে তা সহজে হজম হয় না এবং অধিকাংশ মলপথে বের হয়ে যায়। খাবারের সময় অন্যকে দেবার মত না থাকলে তার বা তাদের সামনে খাদ্য গ্রহণ মোটেও সুন্দর নয়। খাদ্য থাকলে উপস্থিত অন্যকেও আপ্যায়ন করা এবং যদি অপরকে দেবার মত না থাকে তাহলে অন্যের দৃষ্টির অগোচরে একাকী খাবার গ্রহণ করা ভাল। নিজে ভাল ভাল খেয়ে, অহংকার করে অপরের নিকট তা জাহির করা অশোভনীয়। যদি কোন ব্যক্তি তার সামর্থের জন্য খেতে পারেনি এমন খাদ্য অন্যে খেতে দেখে, তবে সে মনে মনে নিজেকে বেশী ছোট, দুর্বল ভাববে এবং নিজের অপারগতার জন্য দুঃখ পাবে। তাই, প্রতিবেশী অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি যেটা খেতে পায়নি তা যদি কারো খাবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়াতো দূরের কথা, ঐ ফল-ফলাদি, খাদ্য দ্রব্যের খোসা-কণাও যাতে ঐ দীন-দরিদ্র ব্যক্তি না দেখে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সকালে নিত্যকর্ম, ব্যায়াম, স্নান ইত্যাদি ভালভাবে সেরে যা খাবার থাকে তা সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণে গ্রহণ করা কর্তব্য। হাপুস-উপুস করে, তাড়াতাড়ি খাওয়া মোটেও

উচিত নয়। তাড়াহুড়ো করে, মল-মূত্রের বেগ ধারণ করে, কথা বলতে বলতে, কোন কিছুতে ঠেস দিয়ে বসে, দাঁড়িয়ে, বাঁকা হয়ে বসে, শুয়ে থাওয়া অনুচিত। অসময়ে থাওয়া, ক্ষিদে নেই এমন অবস্থায় থাওয়া, ক্ষিদে সময় অতিক্রম করে অনেক পরে থাওয়ার ফলে শরীরের ভীষণ ক্ষতি হয় ও রোগ জন্মে। উচ্চাসনে বসে বা ঠেস দিয়ে বসে খেলে খাদ্যনালী কিছুটা বাঁকা হয়ে থাকে এবং খাদ্য প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হয়।

অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খায় ও পান করে। দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে পানাহার উচিত নয়। পবিত্রভাবে রন্ধনকৃত সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। দিনের কোন্ কোন্ সময় খাবার গ্রহণ নিজের জন্য সহজ ও স্বাস্থ্যকর এবং সময়োপযোগী তা চিন্তা করে সে মতে, 'খাবার সময়' ঠিক করতে হবে। যেমন—সকালে ৮টা হতে ৮.৩০টায়, দুপুরে ১.০০ হতে ১.৩০টায় এবং রাতে ৮টা হতে ৮.৩০টায় প্রধান খাবার হতে পারে। স্বল্প পানাহার কোন্ কোন্ সময়ে হতে পারে তা নিজের কর্মস্থল, সুযোগ, সুবিধানুযায়ী পূর্বেই ঠিক করে নিয়ে সেভাবে সারতে হবে। আজ সকাল ৮টায়, আগামী দিন ৯টায়, পরবর্তী দিন ৬টায় এবং কোন দিন ১টায়, কোন দিন ২টায়, কোনদিন ১২টায় এবং কোন দিন স্নান করার আগে, কোনদিন স্নানের পর দিনের প্রধান খাদ্য গ্রহণ ঠিক নয়। নির্দিষ্ট সময়ে স্নান করা ও থাওয়া ভাল। স্নান করার পর পরই (কিছু সময় ক্ষেপণ না করে) খেতে নেই। যে খাদ্যই হোক না কেন, সব সময়ই তা ভালভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। অখাদ্য বা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর তা খেতে নেই। নিজের রুচি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা বিধেয়। অতি অল্প বা উদর অতিপূর্ণ করে খাদ্য গ্রহণ মোটেও ঠিক নয়। নিয়মিত ও পরিমিত, রুচিরূপ, সুস্বাদু, পুষ্টিকর সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তবে কিছুদিন পরপর পানাহার বন্ধ রেখে (যাকে উপবাস বলা হয়) পাকস্থলী খালি করে বিশ্রাম দেয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভাল। এতে পাকস্থলীর হজমশক্তি বেড়ে যায়।

থাওয়া, শরীর সুস্থ রাখা ও দীর্ঘায়ু সম্পর্কে ১৯৬০ সালে ২২শে মার্চ রাশিয়ার শরীর বিজ্ঞানী ডাঃ প্রফেসর ডি.এন. নাকিটন, নিম্নোক্ত তিনটি নিয়ম পালনের উপর বিশেষ জোর দেন।

১. অধিক পরিশ্রম করা। পরিশ্রম উপকারী— যা দেহের শিরা উপশিরাকে সজীব ও সতেজ রাখে।

২. অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করা। অধিক পরিমাণে চলাফেরা করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। দূরপাল্লা ব্যতীত অন্য সকল স্থানে হেঁটে চলাফেরা স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

৩. যে খাদ্য পছন্দ তা খাওয়া কিন্তু মাসে অন্ততঃ একদিন অভুক্ত থাকা। অভুক্ত বা উপবাস পালনের ফলে পাকস্থলীর হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আসল কথা হলো— মন ও শরীর সুস্থ রাখতে আমাদের নিয়মিত পরিমিত আহার করা আবশ্যিক। তবে, যা উদরস্থ করলে দেহে কোন প্রকার রোগ হয় না অথচ শরীর বলিষ্ঠ, ধর্ম প্রবৃত্তির সম্প্রসারণ হয়, শৌর্য, বীর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও চিন্তের প্রসন্নতা সাধিত হয় সেরূপ খাদ্য গ্রহণই প্রশস্ত। প্রতি গ্রাস খাবার ভালভাবে বা পারতপক্ষে ৩০/৩২ বার চর্বণ করে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই হিতকর।

## খাদ্য ও অখাদ্য

জীবন ধারণের জন্য গাছপালা ও সকল প্রাণী চাহিদানুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। স্বাস্থ্য অটুট রাখার জন্য বিচার-বিবেচনায়, পরিপাকশক্তি ও দেহানুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যিক। পুষ্টিকর খাদ্য আহারে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে। অনেক সময় খাদ্যের পুষ্টিমান, শক্তি শরীর যদি হজম করতে না পারে তখন পুষ্টিকর খাদ্যও শরীরের জন্য অহিতকর হয়। খাদ্যদ্রব্যের উপরই নির্ভর করে আমাদের শারীরিক শক্তি, মানসিক বল ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা। কোন কোন রোগের কারণের সঙ্গে যেমন— খাদ্যদ্রব্যের যোগাযোগ থাকে, তেমনি রোগ আরোগ্যের ক্ষেত্রেও খাদ্যদ্রব্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। খাদ্যের উপর নির্ভর করে সবল ও নিরোগ দেহ। খাদ্যের গুণগত উপাদান, আঁশ জাতীয় খাবার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। প্রতিদিনের আহারীয় শতকরা ৪০ ভাগ শ্বেতসার, ১৫ ভাগ আমিষ এবং ৪৫ ভাগ শাক-সব্জি ও ফল দিয়ে পূরণ করতে হবে। সুস্থ দেহের জন্য দিনে অন্ততঃ আধা কেজি সব্জি খেতে হবে। কোন খাদ্য কিরূপ উপকার ও রোগ সারে— তা নিম্নোক্ত কবিতায় কিছুটা ধারণা মিলবে—

স্বাস্থ্য বিধি করলে পালন, চিরসুখী হয় সে জন ।  
 ভোজন করে ক্ষিধে না হতে, হজম শক্তি কমে তাতে ।  
 মলমূত্র বেগ চেপে রয়, সদায় তার রোগের ভয়,  
 পাতে খেলে নুন আদা, অরুচি আর থাকে না দাদা ।  
 অতি ভোজন রোগের মূল, বেশী উপোস তেমনি ভুল ।  
 শিরো রোগ যদি হয়, পানের রসে হবে ক্ষয় ।  
 ক্ষুধা মেরে যে জন খায়, তার পিত্ত বিগড়ে যায় ।  
 চুন চিনি একত্র করে, প্রলেপ দিলে ব্যথা সারে ।  
 নালুকা চূর্ণ প্রলেপ দাও, ব্যথায় কেন কষ্ট পাও ।  
 ওল ঘোল নিত্য খায়, তার কাছে অর্শ না যায় ।  
 শ্বাস রোগ ধরে যারে, ময়ুর পুচ্ছ (ভষ্ম) দিও তারে ।  
 ছোট এলাচ, লবঙ্গ, আদা, বচ কর্পূর তুলসী পাতা,  
 এসব দিয়ে পান খেলে, সর্দি সদা যায়গো চলে ।  
 পোস্তদানা তাল মিছরী, বেটে নিয়ে জলে,  
 গুঁড় কাশি উঠে আসে, চটে চটে খেলে ।

## কিছু খাবারের বিধি নিষেধ

- ১) মাছ, মাংস, দুধ এক সাথে খাওয়া ভাল নয় । মাছ, মাংস যখন খেতে হয়, তখন দুধ না খেয়ে অন্ততঃ দু'ঘন্টা পর দুধ খাওয়া উচিত । উল্লিখিত তিনটি একত্রে খেলে বাত রোগ হয় ।
- ২) চৈত্র মাসে গুড় খেলে ক্রিমি প্রচুর বৃদ্ধি হয় । এতে কলেরা, পেটের অসুখ ও আমশয় রোগ হয় । তাই চৈত্র মাসে গুড় বা মিষ্টি বেশী খাওয়া ভাল নয় । তাল ও কলা একত্রে খেলে ক্রিমি বৃদ্ধি হয় ।
- ৩) ভরা পেটে ঘি খেতে নেই । মুড়ি, মধু ও ঘি খেলে পানি খেতে নেই । তাতে অম্বলের রোগ হয় ।
- ৪) চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মাছের বসন্ত রোগ হয় । কার্তিক মাসে মাছে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায় । তাই বৈশাখ, কার্তিক ও চৈত্র মাসে মাছ খাওয়া ভাল নয় ।

- ৫) রৌদ্রে কাজ করে এসে সঙ্গে সঙ্গে পানি পান করতে নেই। কারণ গরমে মুখ শুকিয়ে যায় এবং খাদ্য নালীটার মুখে লাল গুঁড়িয়ে বন্ধ হয়ে থাকে। তাই, প্রচণ্ড তেষ্টিয় মুখে পানি ঢালা হলে খাদ্য নালী বন্ধের কারণে শ্বাসনালীতে ঢুকে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা।
- ৬) ফল খেয়ে পানি খাওয়া উচিত নয়। ফলে থাকে বিভিন্ন ধরনের এসিড। ফল খাওয়ায় এসিড, পানি এবং অন্ত্রের এসিড-এ তিনের মিশ্রণে অজীর্ণ, অস্থল প্রভৃতি রোগ হতে পারে।
- ৭) কাঁচা লবণ অর্থাৎ পাতে লবণ বেশী খেলে শরীরে বিভিন্ন রোগ হতে পারে এমনকি রক্তচাপ উর্ধ্বগামী হয়। তাই পাতে লবণ বা কাঁচা লবণ না খাওয়া মঙ্গলজনক।
- ৮) শাক পিত্তবর্দ্ধক। দিনের বেলায় শাক খেলে তা হজম করা সম্ভব। রাত্রে দেহ বিশ্রামে থাকে বিধায় পিত্তবর্দ্ধক খাদ্যে দেহের ক্ষতি হয়। তাই, রাত্রে শাক খাওয়া উচিত নয়।
- ৯) চিনির সঙ্গে এলাচ দানা, খেলে হিক্কা আর থাকে না।  
 হরিতকীর কতগুণ, চিবাইলে বাড়ে আগুন।  
 চুষে খেলে অগ্নিবৃদ্ধি, বেটে খেলে কোষ্ট শুদ্ধি,  
 সিদ্ধ করা ধানের ধারক, ঘি'য়ে ভাজা ত্রিদোষ নাশক।  
 নিম খাও, হলুদ মাখো, খোস-পাঁচড়া থাকবে নাকো।  
 মৌরীর জল দু-ঝিনুক, ত্রিশ কোটা চুনের জলে,  
 লেবুর রসে খেলে, বদ হজমে সদ্য ফলে।  
 রক্ত দাস্ত রক্ত বমি, হবে যার  
 দুর্ব্বা রসে চিনি দিয়ে ঔষধ তার।  
 নিমের দাঁতন যেবা করে ব্যবহার,  
 কোন কালে দন্ত রোগ হয় না তার।

উপনিষদে বলা হয়েছে—

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ

সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুব স্মৃতি ।

জীবন ধারণের প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ হয়, তবে অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি গরম ও ঠান্ডা, অতি তীক্ষ্ণ (মরিচাদি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) রাজসিক খাদ্যাদি গ্রহণ দুঃখ, শোক ও রোগের কারণ। খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত-পা, মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে, পরিষ্কার কাপড় পরা অবস্থায় সুন্দর, পরিষ্কার ও পবিত্র আসনে সুন্দরভাবে বসতে হবে। অতঃপর প্রফুল্ল চিত্তে খাওয়া শেষ করতে হবে।

অনেকে লোভাতুর হয়ে অনেক সময় হিতাহিত বিবেচনা না করে শরীর ধারণের পক্ষে যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত মাত্রায় ভোজন করে থাকে যা শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে— উদরের অর্ধেক কঠিন, সিকি ভাগ তরল (পানি জাতীয়) পদার্থে পূর্ণ করে অবশিষ্ট সিকি ভাগ বায়ু সঞ্চালনের জন্য খালি রাখা বিধেয়। শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয়, আমিষ জাতীয়, উদ্ভিদ জাতীয়, চর্বি জাতীয় পুষ্টিকর খাদ্য প্রতিদিন পরিমিত আহার করা প্রয়োজন। তবে যেসব খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের দেহ, স্বভাব ক্রমে ক্রমে তামসিক ও অমানবিক রূপলাভ করে তা বর্জন করা দরকার। মনে রাখতে হবে খাওয়ার জন্য বাঁচা নয়, বাঁচার জন্য খাওয়া। খাদ্য বিজ্ঞানীগণ বলেন— ‘আপনি যা খান আপনি তাই।’ খাঁটি ও টাটকা খাবার খেতে হবে। এতে বিশুদ্ধ রক্ত তৈরী হয় এবং জীবকোষ সুস্থ থাকে।

প্রাতঃরাশে অংকুরিত ছোলাভিজা, আদার কুচি ও লবণ একত্রে মিশিয়ে খাওয়া, দু’চারটি বাতাসা ও চিড়া, আটা বা সুজির রুটি, চিড়া দধি, চিনি বা গুড় দিয়ে পাউরুটি, মাখন কলা অথবা খেচুরী খাওয়া যেতে পারে।

সকাল ১০ টা হতে ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে সফেন ভাত, তরকারী, ডাল, শাক, মাছ এবং সপ্তাহে দু’একদিন তিতাউচ্ছে খাওয়া উচিত। কিশোর যুবকদের দুপুর ১-২টার মধ্যে আটার রুটি, ডাল, তরকারী ফলমূল ইত্যাদি অথবা রুচিমত তরকারীসহ ভাত খাওয়া উচিত।

বিকাল ৪.৩০-৫.০০টায় চিড়া, খৈই, দুধ, কলা, মুড়ি, নারকেল, পাউরুটি খেজুর ইত্যাদি দিয়ে টিফিন করা যেতে পারে।



রাত ৮.০০-৯.০০টায় ভাত অথবা রুটি, তরকারী, ডাল, মাছ-মাংস প্রধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রাতে ও দুপুরে খাবার পর সামর্থ অনুযায়ী মৌসুমী ফল খাওয়া দরকার।

মোটকথায় এমন আহার গ্রহণ করতে হবে- যা সুন্দর, সতেজ, সহজে পাওয়া যায়, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর। বাসি, তৈলাক্ত, অধিক মসলাদি সংযুক্ত খাবার সর্বদা বর্জনীয়। সব খাবার ভালভাবে চর্বণ করে নিরবে খাওয়া ভাল। সুষ্ঠু ও শান্তভাবে স্থিরমতিতে খাদ্য গ্রহণ উত্তম।

খেতে বসে অনেকেই বিভিন্ন গল্পগুজব করে থাকে- এটা ঠিক নয়। নিরবে, স্থিরচিহ্নে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে করতে খেতে হবে। সকল প্রাণীর জন্য সৃষ্টিকর্তা এ পৃথিবীতে আহার সৃষ্টি করে রেখেছেন, তবে যার যার শরীরের ক্ষমতা অনুপাতে তা গ্রহণ করতে হবে।

শরীরের চাহিদা মেটাবার জন্য সৃষ্টিকর্তা যে সকল উপাদান সৃষ্টি করেছেন তা প্রত্যেক স্থানে পাওয়া যায়। এ অপূর্ব সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্তব্য। খাবার সময় নানা গল্পগুজব করলে অনেক সময় দেখা যায় কোন প্রসঙ্গে মতবিরোধের কারণে উদ্বেগ হয় বা হট্টগোল বেঁধে অনেকের খাবার গ্রহণ পড় হয়ে যায়। ভাল চিন্তা করতে করতে খাদ্য গ্রহণ কর্তব্য। যা গ্রহণ করা হচ্ছে তা নিজ শরীরে গিয়ে শক্তি, বল, বীর্য, মেধা সৃষ্টি করবে, এতে দেহ নিরোগ ও শক্তিশালী হবে, এ দেহকে হিতকর্মে লাগানো সহজ হবে, খাদ্যগুলি শরীরে অমৃত হিসাবে কাজ করবে- এমন চিন্তা করতে করতে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। তাড়াতাড়ি, হাপুস-হুপুস করে, বড় বড় গ্রাসে যেন-তেনভাবে গলাধঃকরণ ঠিক নয়। ময়লা, অপরিষ্কার স্থানে, অপরিষ্কার আলোতে, দাঁড়িয়ে, অসময়ে খাদ্য গ্রহণ মোটেও উচিত নয়। দিবা-রাত্রির সংযোগ সময়ে, স্নানের পর পরই (কিছু সময় অতিক্রম না করে), অতি প্রতুষ্ট ও অধিক রাতে না খাওয়ায় শ্রেয়। খাদ্য শরীর ও মনের উৎকর্ষতায় বিশেষ ভূমিকা রাখে বিধায় পবিত্রতা, সুন্দর, পরিচ্ছন্নতা, সজিবতা, পুষ্টি ও পাচ্যতা বিবেচনায় স্থান, কাল অনুসারে খাদ্য গ্রহণ আবশ্যিক।

যেন-তেন ভাবে বসে, দাঁড়িয়ে, কিছুতে ঠেস দিয়ে, শোয়া অবস্থায় বা অর্ধশোয়া অবস্থায়, মলমূত্র ত্যাগকালে, অনেক লোকের উপস্থিতিতে, অতি গরম, অতি ঠান্ডা, বাসি, পঁচা খাদ্য গ্রহণ ঠিক নয়। প্রতিদিন পরিমিত, নিয়মিত সুস্বাদু, পুষ্টিকর, সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক প্রাণীর জন্য সৃষ্টিকর্তার বরাদ্দকৃত

খাদ্য কর্মের মাধ্যমে পাওয়া যায়। হাত বাড়িয়ে খুঁজে বা সন্ধান করে খাদ্য নেয়া, তৈরী করা, গ্রহণ করা এটাও কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

খাবার পর মুখ ধোয়া, দাঁত পরিষ্কার করা, দাঁতের মাড়ি মাজা, দাঁত খেয়াল করে ভালভাবে মুখ পরিষ্কার করা কর্তব্য। খাদ্যেব্যা দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকলে তা পঁচে মুখে দুর্গন্ধ হয়, সহজে দাঁতে রোগ জন্মে, অকালে দাঁত নষ্ট হয়। তাই, দুবেলা খাবারের পর ভালভাবে দাঁত মেজে মুখ পরিষ্কার করা উচিত। প্রতিরাতে শোয়ার পূর্বে দাঁত, মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে। কিছু খেতে খেতে ঘুমানো মোটেও উচিত নয়। অনেকে পান, সিগারেট ইত্যাদি শোয়া অবস্থায় ঘুমানোর আগ পর্যন্ত মুখে রাখে। অনেক সময় ঘুমের অচেতনতার কারণে সিগারেটের আগুনে বিছানাপত্র জ্বলে, এমনকি ঘরে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। নিজ ঘরের আগুনে পাড়া, মহল্লাও ধ্বংস হতে পারে।

অনেকে পান চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়ে। এতে পান, চুন, সুপারীর ক্ষুদ্র অংশ দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পঁচে দুর্গন্ধ, দাঁতের ক্ষয়, দাঁত ও মাড়ীর বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে, দাঁত অকালে পড়ে যায়। গরম খাবার পর-পরই ঠান্ডা, ঠান্ডা খাবার পর পরই গরম খাবার গ্রহণ এবং ফল খাবার পর পরই পানি পান অনুচিত। টক খাদ্য খাবার পর দাঁতে পানি লাগানো দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর। মিষ্টি খাদ্য গ্রহণের পর অবশ্যই দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করা উচিত। খাবার পর হাতমুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে মুখশুদ্ধি ব্যবহার করা দরকার।

খাওয়া শেষ করা মাত্রই কাজে বেরিয়ে পড়া অনুচিত। এতে শরীরে অম্ল, অজীর্ণ, বায়ু প্রভৃতি রোগে আক্রমণ করে।

প্রবাদ আছে—

খাইয়ে যে না জিরাইয়া যায়,

তার পিছে পিছে ঘম ধায়।

খেয়ে যে দ্রুত যায়

যম তার পিছু ধায়

জন্মায়ে বিবিধ ব্যাধি

জীবন নাশিবে।

## শয়ন/বিশ্রাম

দিন রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেশীরভাগ মানুষ দিনের বেলায় বেশী সময় শ্রম দিয়ে থাকে এবং রাতে ঘুমে বা বিশ্রামে কাটায়। প্রায় সব দেশেই এ নিয়ম প্রচলিত। শহরে অনেকে রাতেও শ্রম দিয়ে থাকে। কাজের পার্থক্য অনুসারে ক্ষেত্রভেদে মানুষ দিনে বা রাতে পরিশ্রম করে। সে অনুসারে পরিশ্রমকারী দিনে বা রাতে ঘুমায়। বেশীর ভাগ প্রেস শ্রমিক ও নৈশ প্রহরীরা রাতে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং দিনে ঘুমায়। আবার দিনে যারা অফিস-আদালতে, ব্যবসায় দায়িত্ব পালন করে তারা রাতে ঘুমায়। রাতে প্রকৃতি অধিকতর শান্ত থাকে তাই রাতে ঘুমানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। মানুষ, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ তথা সকল জীব নিদ্রা যায়। এ নিদ্রা বিলাসিতার জন্য নয়। মানুষ নিদ্রা যায় উৎকৃষ্টরূপে আলাপচারিতার জন্য, উৎকৃষ্ট কাজের জন্য, সুন্দর চিন্তার জন্য, দুর্বলতার অবসানে উদ্ধামপূর্ণ কর্মস্পৃহার জন্য। মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় কাজ করে, তা যেন স্রষ্টার উদ্দেশ্যেই করে—এরূপ মন-ধ্যান থাকলে ভাল হয়। শয়ন বা বিশ্রামের সময় স্রষ্টার নিকট প্রার্থনা করা ভাল। দু'চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে, পুরো শরীর হেলিয়ে না পরা পর্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ নিজের জাগ্রতবোধ থাকে ততক্ষণ স্রষ্টার নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্মরণ করে ঘুমাতে হবে। এরূপ হলে আপনা-আপনি স্রষ্টার নাম স্মরণ বা জপ শ্বাসে-প্রশ্বাসে চলতে থাকবে।

এমনও দেখা গেছে, কোন কাজে জড়িত না থেকেও অনেকে বাজে আড্ডায় সময় কাটায়ে অধিক রাতে ঘুমাতে যায়। অধিক রাতে ঘুমানোর ফলে অনিচ্ছায় বীর্যক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে। ঘুমে অনিচ্ছাকৃত বা বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে বীর্যক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষ রোধের জন্য শয়নের পূর্বে হাত কুনই পর্যন্ত, পা হাটু পর্যন্ত, জননেন্দ্রিয়, অভ্যকোষ, মুখ ইত্যাদি ঠান্ডা পানিতে ভালভাবে ধুয়ে স্রষ্টার নাম (যার যেমন রুচি) করতে করতে পবিত্র মনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে শয্যা গ্রহণ করতে হবে। শোয়ার সময় পুরুষের পক্ষে প্রথমে চিৎ হয়ে পরে বাম পাশ হয়ে ঘুমানো ভাল।

শয্যায় কোল বালিশ বা পাশ বালিশ ব্যবহার মোটেও উচিত নয়। কঠিন শয্যায় একাকী শয়ন করতে হবে। অপরের সঙ্গে একই শয্যায় শয়নে বিভিন্নভাবে কামেচ্ছার বশবর্তী হয়ে উভয় কিশোর বা যুবক বা কিশোরী বা যুবতী সহসা আদর্শচ্যুত হয়ে স্বাস্থ্য হারায়ে অল্প বয়সেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে। চাকর-চাকরানীর সাথে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে, আত্মীয়-কুটুম্বের সাথে অর্থাৎ কারো সাথে একই শয্যায়

ঘুমাতে নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পৃথক শয়্যায় একাকী প্রসন্ন চিত্তে ঘুমাতে হবে। যদি পৃথক শয়্যার অভাব ঘটে তবে ধরনী মাতার উন্মুক্ত বক্ষে শুয়ে, বসে, স্রষ্টার নাম জপ করতে করতে রাত কাটাতে হবে। তবুও কখনো, কোথাও অপরের সঙ্গে একই শয়্যায় রাত কাটানো, শয়ন করা মোটেও ঠিক নয়। দিবা নিদ্রা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। যাদের দিবা নিদ্রার কুঅভ্যাস আছে তা ত্যাগ করতে হবে।

অনেক কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী রাতে কামেচ্ছার বশবর্তী হয়ে শয়্যায় গিয়ে জনেন্দ্রিয় ধরে বা জনেন্দ্রিয় নাড়াচাড়া করে—এ বদভ্যাস খুবই খারাপ। শৌচ কাজের সময় ব্যতীত কখনো জনেন্দ্রিয় স্পর্শ করা যাবে না। নিজে নিজে কঠোর সংকল্প করতে হবে কামতৃপ্তির জন্য কখনো শয়্যায় গিয়ে বা অন্য কোথাও জনেন্দ্রিয় স্পর্শ করবে না। সকল সময়ে সজোরে কৌপীন পরিধানে থাকতে হবে। এমন অভ্যাস করতে হবে, অঘোর নিদ্রার সময়েও হাত যেন নাভির নিচে না যায়। নাভি হতে গুহ্যমূল পর্যন্ত অঙ্গটুকু যেন হিমালয়ের শীতলতম স্থান এ রূপে সর্বদা ধ্যান করতে হবে। যতই অসুবিধা সহ্য করতে হয় হোক, তবু কোন সময়ে অপরের সাথে শয়ন করা যাবে না। এমন দেখা গেছে অনেক সুন্দর সরল প্রাণ সুকুমার শিশু-কিশোর অপরের সাথে একই শয়্যায় শয়ন করে বিভিন্ন কুকার্য শিখে অকালেই বিভিন্ন রোগব্যাদিগ্রস্থ হয়ে জীবন নাশ করেছে। যে কজন বেঁচে আছে তারা সংসারে সদা অশান্তিতে ক্লিষ্ট অবস্থায় শ্রীহীন দেহে দিন কাটাচ্ছে।

কঠিন বিছানা শয়নের জন্য উত্তম, কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় বা চলা-চরিত্রে প্রায় সকলে নরম বিছানায় শয়ন করে যা মোটেও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। চিৎ ও উপুড় হয়ে ঘুমানো ঠিক নয়। অল্প নিদ্রা, অতিনিদ্রা, অগভীর নিদ্রা, দিবানিদ্রা মোটেও ভাল নয়। এসব কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। ঘুমাতে যাবার পূর্বে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি পান করতে হবে।

আয়ুর্বেদ ও যোগশাস্ত্রের বর্ণনামতে—ঘুমানোর পূর্বে অন্তত এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে রাত ১০/১১টার মধ্যে ঘুমান উচিত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ১/২ লিটার ঠান্ডা পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য হিতকর। বন্ধঘরে বা যে ঘরে ভালভাবে বাতাস বহে না, দুর্গন্ধ, সঁাতস্যাতে এমন ঘরে ঘুমানো মোটেও উচিত নয়।

## বীৰ্যক্ষয় ও তার প্রতিকার

ব্রহ্মচর্য পালনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে- বীৰ্যক্ষয় না করা। আমরা দৈনন্দিন যা আহাৰ করি তা পরিপাক হয়ে রসে পরিণত হয় এবং বর্জ্য অংশ মল-মূত্র হিসেবে বের হয়ে যায়। এ রসের সারভাগ পরিপাক হয়ে রক্তে, রক্ত পরিপাক হয়ে মাংসে, মাংসের সারভাগ মেদ, মেদের সারভাগ অস্থিতে, অস্থির সারভাগ মজ্জাতে এবং মজ্জার সারভাগ শুক্র বা বীৰ্য নামক মহামূল্যবান ধাতুতে পরিণত হয়। আহারীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে উল্লিখিত নিয়মে সর্বশেষে শুক্রে পরিণত হতে অন্ততঃ তিন দিন সময় লাগে।

মানবশিশু জন্মলাভের পর ধীরে ধীরে বড় হয়। অন্ততঃ কিশোর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ শরীরে পূর্ণ কামভাব জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত ঐ দেহ স্থির, উজ্জ্বল, লাভণ্যময় থাকে। ঐ বয়সে দেহ ক্রমে বৃদ্ধি হয়। যুব বয়সকালে প্রত্যেকে বিপরীত মানুষটিকে কাছে পেতে চায়। যার সর্বশেষ ফলাফলে উত্তেজনা, অতঃপর বীৰ্যক্ষয়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান বলে- শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাণু সমূহের দ্বারাই শুক্রধাতু নির্মিত হয়ে থাকে। ছত্রিশ দিন খাদ্য গ্রহণে যে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ইত্যাদি তেজোময় পদার্থ উৎপন্ন হয় এতেই এক বিন্দু বীৰ্য হয়। দুধে যেমন মাখন ও ত্রপ্রোত্ৰভাবে মিশ্রিত থাকে তেমনি মানব দেহেও রক্তের সাথে শরীরের সারভূত বীৰ্য মিশ্রিত থাকে। কামভাবে দেহ যখন উত্তেজিত হয় তখন শিরা-উপশিরায় রক্তপ্রবাহ প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। মানুষ দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে থাকে। তখন বিপরীত দেহের সাথে মৈথুন অর্থাৎ পুরুষ হলে মেয়ের, মেয়ে হলে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। এতে কাম ইন্দ্রিয় অপব্যবহারের মাধ্যমে বীৰ্য ক্ষয় হয়।

কোন নারী-পুরুষের কামদৃশ্য দর্শন, উত্তেজনা বৃদ্ধি ঘটে এমন গল্প-আলাপ বা ঐরূপ গল্পের বইপড়া, নারী দেহ স্পর্শ করা, ছবি দেখা, কামচিন্তা, অন্তরাল হতে নারী-পুরুষের উলঙ্গ দেহ দর্শন, গোপন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা অপব্যবহার ইত্যাদির কারণে নারী-পুরুষের বীৰ্য ক্ষয় হয়।

মনে রাখতে হবে- মহামূল্যবান ধাতু অপচয় হবার পেছনে বিপরীত লিঙ্গের সাথে মেলামেশা, আলাপচারিতা এবং অঙ্গ স্পর্শই প্রধান কারণ। যুবকালে ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দেহ স্পর্শ করতে ও উত্তেজক গল্প-আলাপ করতে ভালবাসে।

এসময় দেহের, মনের আকর্ষণ ও চাহিদা হতে বিবেক, জ্ঞান ও মনবল শক্তির প্রবল চেষ্টায় নিজেকে বিরত রাখতে হবে। মন চাইলে বা সুযোগ পেলেই এ মেয়েটির সাথে কথা বলা, হাসি-তামসা কৌতুক করা চলবে না। কোন মেয়ে-ছেলে যদি আকর্ষণে কাছে আসে, বিভিন্ন আলাপ করতে চায় তখন মনও দুর্বল হবে- এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এতে বিভিন্নভাবে ক্রমে বীর্যক্ষয় হয়ে বুদ্ধি, মেধা চিন্তাশক্তির অপচয় হবে, উন্নতিতে বাধা হয়ে সর্বনাশ হবে- এটি কঠোর মনোবলে স্মরণ রাখতে হবে। কোন মেয়ে-ছেলের প্রতি একটু একটু করে আকর্ষণ বাড়তে বাড়তে এমন হয় তাকে না দেখলে, তার সাথে কথা না বললে, তাকে স্পর্শ না করলে, স্নেহ না আদর না করলে, তার সাথে হাসি-তামসা না করলে মোটেও ভাল লাগে না। তাই বলে যখন শরীর রক্ষা করে বৃদ্ধির সময়, যখন লেখাপড়ায় উন্নতির সময় ও স্বাস্থ্য গঠনের সময় এ সময় মেয়ে-ছেলের প্রতি কামভাবে ঝুকে পড়বে? এ বিরাট অন্যায়। বিবেক বুদ্ধিতে একবার ভেবে দেখতে হবে এটি কি এ সময়ে উচিত হচ্ছে? না-মোটেই না। যে কাজের কারণে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে অনর্থ ঘটবে, সমাজ হয়ে ভাবে সে কাজে অগ্রসর না হওয়ায় উত্তম।

সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে-

মরণং বিন্দুপাতেন

জীবনং বিন্দু ধারণাং।

বীর্যক্ষয়ই মৃত্যু, বীর্য ধারণেই জীবন। এক ফোঁটা বীর্য অনেক অনেক শক্তি। যার যত বীর্য ক্ষয়, তার তত রোগের ভয়। একটি সুন্দর পাত্রের তলদেশে যদি ছিদ্র থাকে- ঐ পাত্রে দুধ, ঘি, মধু যা রাখা হোক না কেন তা যেমন থাকবে না, তেমনি পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সর্বক্ষেত্রে সংযমী জীবন-যাপন না করলে দেহরূপ এ ভান্ড/পাত্রে কামভাবের উদয় হয়ে স্বপ্নদোষ বা বিপরীত লিঙ্গের খপ্পরে পড়ে অকালে বীর্যক্ষয়ে, মেধা, বুদ্ধি, শ্রীহানী হবে। শরীর হবে রোগা। জীবন বিপথে চলে বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সুন্দর মনুষ্য জীবনটা পশুতুল্য, অবোধ জীবনে পরিণত হবে। বীর্যক্ষয়ের কারণে দেহ হবে- লাভণ্যহীন, রোগগ্রস্ত, খিটখিটে, ক্ষীণদৃষ্টি, বুদ্ধিহীন, উৎসাহহীন, অবসাদগ্রস্ত দুর্বল, আত্ম-অবিশ্বাস ও আশাহীন। বীর্যক্ষয়ের দ্বারা দেহ আলস্যে, দুর্বলতায়, কুচিন্তায় ভরে ওঠে।

এতে এ মনুষ্য জীবনে কিছু করে উন্নতি লাভ করতে খুবই দুঃসাধ্য হয়। এমনকি বিবাহিত জীবনে পরমাসুন্দরী সহধর্মিনী স্ত্রীও অবাধ্য হবে। অন্যায় পথে পা বাড়াবে, সংসারে অশান্তি হবে, মনে রাখতে হবে—নিজের কু-চাল-চরিত্রের কারণে পুরুষেন্দ্রিয় দুর্বল হয়, দাম্পত্য জীবন বিষতুল্য হয়। বীর্যক্ষয়ের ফলে মন, মেজাজ এত খিটখিটে হয় যে, ভাল কথা, ভাল চিন্তা, ভাল উদ্দেশ্য মাথায় আসে না। হীনবীর্যের কারণে এ পৃথিবীতে বড় যাদু নামে খ্যাত নারীর হাসি হতেও বঞ্চিত হতে হয়।

জীবনে বীর্যধারণ একান্ত প্রয়োজন। বীর্যধারণের ফলে হৃদয়ে ভালবাসা পঞ্জীভূত হয়, হৃদয় আলোকিত হয়, মন-প্রাণে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। স্বাস্থ্য সুন্দর ও লাভণ্যময় হয়। দৃষ্টিশক্তি, স্মরণশক্তি, আয়ু বৃদ্ধি পায়। যে কোন বিষয়ে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হয়। বীর্যধারণই জীবন।

জীবন চলার পথে শত বাধা-বিষের মধ্যেও সদা হাস্যেৎফুল্ল থাকতে হবে। যাবতীয় হিতকর নিয়ম-শৃঙ্খলা পুংক্ষানুপুংক্ষরূপে পালন করে শান্তভাবে নিজেকে নিজের পরম বান্ধব বলে বিশ্বাস করতে হবে। জীবনে সব অগ্নিজ্বালার মধ্যেও স্রষ্টার স্নেহশীতল আশীষ অনুভব করে চলতে হবে। ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা বীর্যধারণ সহজতর হয়। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সুন্দরভাবে জীবনযাপনে শরীর রক্ষা করে স্রষ্টার সাম্রাজ্যের পথে চলতে হবে। ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সুরক্ষিত, সুগঠিত দেহ স্রষ্টার নির্দেশিত মঙ্গল কাজে বিলিয়ে দেয়া হয় এবং বিশ্বমানব সাধারণের কল্যাণার্থে বির্ষজন দেয়া প্রশংসনীয় ও সমর্থনীয়। কিন্তু যদি ইন্দ্রিয় সেবায় অর্থাত্ কাম তাড়নায় পশু শ্রেণী সুলভ পথে বা শয়তানী কাজে এ মহামূল্যবান শক্তিকে নষ্ট বা অপচয় করা হয়—এরফলে শরীরে ব্যাধিই উত্তমভাবে বাসা বাঁধে। এ ধরনের জীবনের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। সুতরাং ছেলে-মেয়ে উভয়কে কুমার-কুমারী জীবনে একে অপর থেকে দূরে থেকে কামভাব ত্যাগে শালিনতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে।

## মানব ধর্ম

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণকারী মানুষ বর্তমানে বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়ে পৃথকী ভাগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করায় এক মানব জাতি বহু ভাগে বিভক্ত হয়েছে। অথচ, জন্মগ্রহণকালে কোন শিশুর এরূপ (গোত্র, সাম্প্রদায়িক) মনোবৃত্তি থাকে না। যে কোন নারীর গর্ভ থেকে সহজ সরল নিষ্পাপ এক শিশু ভূপৃষ্ঠের আলো-বাতাসে আসে অর্থাৎ জন্ম নেয়। সে কী হিন্দু, না মুসলমান, বৌদ্ধ কী খ্রীষ্টান এরূপ ভাব বা চিন্তা তার থাকে না। থাকে না— হিংসা, বিদ্বেষ, কুচিন্তা বা অদ্রুপ কোন কুআচরণ বা কুমনোভাব। বড় হতে হতে পারিপার্শ্বিক, সামাজিক রীতিনীতি/চালচলনে সে জড়িয়ে যায়।

জন্ম যেখানে, যে দেশে, যেই নারীর গর্ভে হোক না কেন— প্রত্যেকে সৃষ্টির সৃষ্টি, প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা আছে, জন্মে কোন জাত-পাত নেই, গোত্র-সম্প্রদায় নেই। যে অভ্যাসে যে শিশু যেভাবেই গড়ে ওঠে, সে ভাবেই অর্থাৎ সে মতাদর্শেই সে শিশু বড় হয় এবং প্রায়ই সেভাবেই জীবন-যাপন করে থাকে। মানব শিশুর ধর্ম-মানব ধর্ম। কোন ঘরে, কোন সময়ে, কোন মতাদর্শের ঘরে জন্ম তা নিয়ে কোন কথা নয়, প্রশ্ন নয়। আগুনের ধর্ম যেমন দাহ্য করা, পানির ধর্ম যেমন সমুচ্ছশীলতা ও নিচের দিকে বয়ে চলা, মাটির ধর্ম যেমন সহনশীলতা, কুকুরের ধর্ম যেমন প্রভু প্রীতি, চুষকের ধর্ম যেমন লৌহকে আকর্ষণ করা, সূর্য যেমন ধনী-দরিদ্র, ভাল-খারাপ সকলের তরে সমভাবে কিরণ দেয় তেমনি মানুষেরও ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী রয়েছে। মানুষের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

ক) অহিংসতা : সর্বজীবে অহিংসতা। সর্বপ্রাণে অহিংস মনোভাব। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে নয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সর্বজীবে, সর্বপ্রাণে। যাকে হিংসা করা হয় তার কিছু হয় না, হিংসুক ব্যক্তি হিংসার অনলে জ্বলে-পুড়ে মরে। হিংসা পরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পারে না।

খ) সত্যশ্রয়ী : কখনো মিথ্যা না বলা। সর্বাবস্থায় সত্য বলা। সত্যতে জীবন-যাপন করা। সত্য না বললে নিজের এবং অপরের ক্ষতি হয়। মিথ্যা বললে বাকসিদ্ধ হয় না। মিথ্যুককে কেহ ভালবাসে না।



গ) দয়াদ্রতা : সর্বজীবে দয়া প্রদর্শন। সব প্রাণী- যার প্রাণ আছে। গাছেরও প্রাণ আছে। গাছ, তৃণ, গুল্ম ইত্যাদির প্রতিও দয়া প্রদর্শন। জলজ, স্থলজ, খেচর ইত্যাদি, ইত্যাদির প্রতি দয়া প্রদর্শন করা।

ঘ) সেবাপরায়ণতা : সর্বজীবে ভালবাসা, স্নেহপ্রীতি প্রেমপূর্ণ সানন্দভাব। সৃষ্টির সব প্রাণকে সেবা করা। সব প্রাণীর কল্যাণ করা- সর্বভূতহিতে রতাঃ।

ঙ) নিরোভ, নিরহংকার, নিরভিমानी হওয়া। লোভ ত্যাগ করা। লোভ হতে বুদ্ধি বিচলিত ও তৃষ্ণা জন্মে। অহংকার ত্যাগ করা। অভিমান ত্যাগ করা। লোভ, অহংকার ও অভিমান মনুষ্যত্ব অর্জনে বাধা স্বরূপ। লোভ প্রজ্ঞাকে বিনষ্ট করে।

চ) অক্রোধী হওয়া। যেকোন অবস্থায়, যে কোন স্থানে, যে কোন বিষয়ে ক্রোধ না করা। ক্রোধের কারণে সব পতন হয়। ক্রোধ জয়ের প্রতিজ্ঞা করতে হবে। ক্রোধের সময় চুপ থাকা ক্রোধ জয়ের কারণ। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন-  
ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা  
অসাধুকে সাধুতা দ্বারা  
কৃপণকে দান দ্বারা  
অসত্যকে সত্য দ্বারা  
জয় করতে হবে।

ছ) পরশ্রীকাতর না হওয়া। ঈর্ষা পরায়ণ ব্যক্তি কলংক ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পায় না। সে কুসুমে শুধু কীট দেখে, চাঁদের কলংক দেখে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, ফুলের গন্ধ সে অনুভব করতে পারে না। পরের ভালো সে সহ্য করতে পারে না।

জ) নেশা বর্জন। যে কোন প্রকার নেশা দ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ না করা। নেশা দ্রব্য বা পানীয় জীবনীশক্তি বিনষ্ট করে, এতে ধী শক্তি লুপ্ত হয়।

ঝ) কাম ত্যাগ : কামভাব জাগ্রত হতে না দেয়া। কামভাব সৃষ্টি হয় সেরূপ কোনকিছু দৃষ্টিতে, কথায়, আচরণে, চিন্তায় ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে যেন প্রকাশ না পায়। কাম মানুষকে হীনবীর্য, দুর্বল ও চঞ্চল মতি করে। শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়।

উপর্যুক্ত ভাব ছাড়াও অন্যান্য যে সব বিষয় মানুষকে সুশৃংখল, বিনয়ী, উদার, প্রজ্ঞান, সদালাপী, সুবিবেচক ইত্যাদি গুণাবলীতে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে বা গড়ে তুলে তা মানুষের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বা মনুষ্যত্ব। মানুষের জীবনে দুটি ভাব— একটি অসুর ভাব— যা দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, ভোগ-লালসা, প্রভৃত্ব-প্রিয়তা, অহমিকা, সংকীর্ণচিত্ততা। অন্যটি দৈবভাব— যা অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য ও সমদর্শন। মানুষকে অসুরভাব ত্যাগ করে দৈবভাবে ভাবিত হয়ে জীবনে অশ্রসর হতে হবে।

মানুষের মনুষ্যত্ব অর্জন করাই হচ্ছে ধর্ম। একটু সুস্বভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে— জীবন চলার পথে সমাজে দৃশ্যমান আচরণ, বেশ-ভূষা, চাল-চলন, নামে-কাজে পৃথক ভাবের দ্বারা পৃথক ধর্ম বুঝা যায় না। ধর্মের কারণে বা ধর্মাজনে এসবের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই পৃথক ক্ষেত্র তথা মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ক্যায়াং ইত্যাদি ইত্যাদির। এগুলোতে ধর্ম নিহিত নেই। ধর্ম নিজ দেহে, মনে, প্রাণে। ধর্ম অর্জন করতে হবে। মনুষ্যত্ব অর্জনই ‘ধর্ম’।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি তথা মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য যুগে যুগে এ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁরা এক স্রষ্টা স্বীকারে, স্রষ্টাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে মানব জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, সমাজের প্রতিক্ষেত্রে উন্নতির বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন— সকল মানুষের জন্য। মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা এবং মানুষ বেশী বুদ্ধিমান তাই মানুষ সর্বদিকে মনপ্রাণে, কাজে, চিন্তা-চেতনায় উন্নত হলে অন্যান্য সৃষ্টিরও উন্নতি হবে, পরিবেশ সুন্দর হবে, জগৎ আনন্দময় হবে। সকলে রক্ষা পাবে। সকলে শান্তিতে থাকবে।

আবির্ভূত মহাপ্রাণ, মহামানব, যুগস্রষ্টা, মহানবী, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ, মহাঋষি, মহাগুরুগণ তাঁদের শাস্ত্র মতাদর্শ সকল মানবের জন্য অকাতরে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মতাদর্শ প্রচার করেছেন— সকল মানুষের জন্য, মানুষের মধ্যে কোন ভেদ বিভক্তি তাঁরা করেননি। অথচ, যুগ পরিক্রমায় তাঁদেরই উত্তরসুরীগণ সংকীর্ণ চিন্তায় এক এক মতাদর্শকে এক এক গোত্রীয়, সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে বিভিন্ন মতাদর্শের/আধ্যাত্মিক পথের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, ক্যায়াং ইত্যাদি ইত্যাদিকে আধ্যাত্মিকতা অর্জনের গৃহ/ভবন/আশ্রয়স্থল বলে প্রচার প্রসারে এক মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, নিজ দেহকে মন্দির, মসজিদ, গীর্জা ইত্যাদির মত আধ্যাত্মিক আশ্রয়/কেন্দ্র ভাবতে হবে। সেভাবে

জীবন গড়তে হবে। কিন্তু মতাদর্শ নিয়ে পৃথিবীতে এরূপ (ভেদাভেদ) সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ গোত্র-সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। অথচ, সবারই স্রষ্টা, সর্ব কারণের কারণ সে একজনই। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর জনক।

তাকে কেহ আল্লাহ, কেহ গড্, কেহ পরম দয়াল, দয়াল বাবা, ভগবান, কেহ ঈশ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি নামে ডাকেন। অঞ্চলভেদে, ভাষাভেদে যে যে নামেই ডেকে তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ লাভ করে সে সেই নামেই ডাকেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছুর মূলে সৃষ্টিকর্তা। প্রকাশ ভঙ্গি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ইত্যাদি অঞ্চলভেদে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু সব প্রাণী, সব মানুষ সব সৃষ্টি মহান স্রষ্টার। সে হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পরের আত্মীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় ধর্মের স্বরূপ বলতে বুঝানো হয়েছে— নিজের রূপ। স্ব অর্থ নিজ। রূপ অর্থ আকৃতি, পরিচয়, লক্ষণ। অর্থাৎ মানুষের পরিচয়, লক্ষণ বা মানুষের গুণাবলী তথা মানব ধর্মের গুণাবলী— অহিংসা, দয়াদ্রতা, অক্রোধী, সত্যশ্রয়ী, নির্লোভ, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও বর্তমানে প্রায় সকলে ঐসব গুণাবলী অর্থাৎ মনুষ্যত্ব অর্জন বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠান, গোত্র, বংশানুকেন্দ্রিক বিশ্বাস, আচরণ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নির্ভর করে ঐভাবেই ঈশ্বর, গড্, ভগবান, আল্লাহ, দয়ালবাবা অর্থাৎ স্রষ্টাকে পাবার উপায় বলে প্রচার করে।

নিজের মধ্যে স্রষ্টা বিরাজিত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই নাস্তিক। জাগতিক জগতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বহু যুগ ধরে চলমান স্ব স্ব মতাদর্শকে ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি ইত্যাদি পথানুসারীরা মানুষের মধ্যে, সমাজের মধ্যে পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছে। মানুষের কল্যাণে, সৃষ্টির কল্যাণে যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে আবির্ভূত মহামানবের মহাসত্যকে নিয়ে দল, গোত্র, সম্প্রদায়গতভাবে দলাদলী, টানাটানি, মারামারী ও কাটাকাটিতে যত অঘটন ঘটেছে, যত ক্ষতি হয়েছে, যত প্রাণ বলি হয়েছে— অন্য কিছুতে তত ক্ষতি হয়নি। এ কারণে বিশ্বখ্যাত মণীষী কার্ল মার্ক্স বিভিন্ন ধর্মের অনিষ্টকারীতা দেখে জাগতিক মতাদর্শকে (ধর্ম নামে খ্যাত) মানব জাতির শত্রু ‘অহিফেন’ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

নিম্প্রাণ জগতের প্রাণ ও জনগণের একটা অব্যক্ত নেশা ধর্ম নয়। জীবনের পূর্ণতার পথ, জীবনের অগণিত দুঃখ তাপ হতে মুক্তির উপায় হচ্ছে ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন- ‘পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ দর্শনই ধর্ম, ভেদ দর্শনই পাপ। ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ।’

এতে বুঝা যাচ্ছে- মানুষের ভিতর প্রথম থেকেই ব্রহ্মত্ব বিদ্যমান আছে, একে প্রকাশ করতে পারলেই ধর্ম হবে। প্রকাশ করা মানে ‘চৈতন্য’। মানুষ ভূমিষ্ট হবার পর থেকে প্রচলিত জাগতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আচরিক প্রথাকে কেন্দ্র করে জীবন ধারণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের জন্য নেই। অথচ, মানব সন্তান সমাজে, যেখানে, যে পরিবেশে, যে গোষ্ঠী কেন্দ্রিকভাবে ও যে সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠে সে সেভাবেই জীবন নির্বাহ করে।

বংশানুক্রমিক আচরিত, মান্যনীয় মত ও পথে ছোট হতে মানব শিশু অগ্রসর হয় কিন্তু তার দেহ গহ্বরেই স্রষ্টার অপার অমূল্য চৈতন্য শক্তি পূর্ব হতে বিদ্যমান- এ বিষয়টি তাকে (মানব শিশুকে) না জানায়ে বা জানতে সহায়তা না করে, সমাজে পূর্ব হতে চলমান আচরিক প্রথার দিকে তাকে ধাবিত করা হয়।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী কোন নর-নারীর মধ্যে বড় ধরনের কোন প্রভেদ নেই, শুধুমাত্র মস্তিষ্কের ভিন্নতা ছাড়া। অথচ, মানুষের মধ্যে আচরিক প্রথার (ধর্ম হিসেবে কথিত) কারণে ভেদ-বৈষম্য, দলাদলী, হিংসা-বিদ্বেষ, নিজের আচরিক প্রথা- বড়, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ সংস্করণ ইত্যাদি ইত্যাদির বারাবারি, তর্কযুদ্ধ শেষে খুনাখুনিতে বিশ্বের মানুষের মধ্যে অশান্তি, উশৃংখলতা, বিদ্বেষ, হিংসাসহ যতসব অপরাধবোধের জন্ম দিয়ে মানব-জাতিকে পৃথক খন্ড খন্ড গোত্র, দল সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

এ নিবন্ধে আলোচিত দৈহিক/মানবিক ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়াবলী মতে পরিপূর্ণ একজন মানুষই মানব ধর্মের এক ধাপে উন্নীত হয়। অসম্প্রদায়িক বিশ্ব রচনা করে বিশ্বব্যাপী এক মানব জাতির এক মহাপরিবার গড়তে হবে। সকল মানবের মধ্যে আত্মীয়তার যোগ সূত্রকে দৃঢ় করতে হবে বিশ্বজুড়ে। মানব ধর্ম আচরণে সকলকে ব্রতী হতে হবে। এতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় হবে, সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ হবে, বিশ্বে শান্তি আসবে।

## শেষ পর্যন্ত ভাল মানুষ

সব কথার শেষ কথা— শরীরকে পবিত্র রাখা এবং শরীরস্থ গুরুদ্রব্যকে অবিচলিত ও অবিকৃত রাখার উপায় হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। এ পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় মতে সংযমের সাথে গড়ে উঠার অর্থই হচ্ছে— সুষ্ঠু সুন্দর পবিত্র উন্নত চরিত্রবান এক ভাল মানুষ হওয়া। একজন ভাল মানুষ দেবতাতুল্য। সমাজ, দেশ ও বিশ্ববাসী ঐ মানুষটিকে চিরদিন সম্মান করে, পূজার আসনে বসায়। নৈতিক চরিত্রগুণ সম্পন্ন মানুষ সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের অমিয় বাণী জীবনব্যাপী প্রতি ক্ষণে ক্ষণে মনে রেখে সে অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে—

- ❑ বিশ্ব জগতে এ মানব দেহই শ্রেষ্ঠ দেহ এবং মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ সর্বপ্রকার জীবজন্তু হতে, এমনকি দেবাদি হতেও উচ্চতর। মানুষ অপেক্ষা উচ্চতর আর কেহ নেই।
- ❑ জগতের ইতিহাস হল— পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস। আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন— অনুভব করার হৃদয়, ধারণা করার মস্তিষ্ক এবং কাজ করার হাত। যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান হও, তাহলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হতে পারবে।
- ❑ জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশি মূল্যবান।
- ❑ ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান তারই প্রকাশ।
- ❑ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও— প্রাণের ভয় পর্যন্ত রাখিও না। ধর্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। ওঠ, জাগো, নিজে জেগে অপরকে জাগাও।

# স্বভাব জানা মানুষ চেনা

ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে ভাল মানুষের ভিত্তি গড়ে উঠায় ঐ মানুষটি এবার গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করবে। প্রশ্ন হতে পারে— যারা ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে ভিত রচনা করবে না, তারা কী গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত হবে? না, তা নয়। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে একজন মানুষের জীবনের চলার পথ প্রশস্ত হয়। নিজের ভুলত্রুটি নিজেই দেখতে পারে, দেহ সুগঠিত হয়, ঐ লোকটির দ্বারা কারো ক্ষতি হয় না, তার দ্বারা জগতের উন্নতি হয়, কল্যাণ হয়। তাইতো প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য পালনে সকলকে ব্রতী হওয়া। ব্রহ্মচর্য পালনের পর যথাসময়ে গার্হস্থ্য জীবনে পদার্পণের পূর্বে নর-নারী ও বিয়ে সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

একজন মানুষের জীবনে তার সাথে অনেকের দেখা হয়, কথা হয়। জীবন চলার পথে অনেক পুরুষ ও মহিলার সাথে কথা-বার্তা, লেন-দেন, প্রেম, স্নেহ-ভালবাসা, রাগ-বিরাগ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং অনেকে খুব নিকট সান্নিধ্যে আসে। কোন কোন সময় একজন অপরজনের প্রীতিময় ব্যবহারে খুব কাছে আসে বা রাগ-বিরাগে একে অপরের খুব দূরে সরে যায়। এ জগতে প্রত্যেক মানুষের আচরণ পৃথক। একের সাথে অন্যের হুবহু মিল নেই।

প্রত্যেক বিষয়ে অন্যের সাথে বেশী মিল হলে সেক্ষেত্রে প্রীতিবন্ধন জোরালো হয়। মিলের পরিমাণ কম হলে সে ক্ষেত্রে প্রীতিবন্ধন হালকা হয়। সে কারণে যার সাথে বেশী মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন, পূর্ব হতে তার সম্পর্কে জানা দরকার। তাহলে উভয়ের অবস্থান সহনীয় ও মধুময় হয়। তাই, নারী-পুরুষ সম্পর্কে জানার জন্য কয়েকটি লক্ষণ নিম্নে উল্লেখ করা হল। তবে সবার (সব নর-নারীর) ক্ষেত্রে বর্ণিত স্বভাব-চরিত্রের মিল ও অমিল হতে পারে। যাঁদের স্বভাব-চরিত্রের বিষয়ে হুবহু মিলে যায় তাঁদের প্রশংসা বা হেয় করার উদ্দেশ্যে এমনটি রচিত হয়নি— এ জন্য সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

## ক) পুরুষ স্বভাব চরিত্র

দলপতি হয়

- হাত দুটি লম্বা যার ঘাড় লম্বা অতি

শাস্ত্র বলে এমন লোক হয় দলপতি।

- হাত দুটি হাঁটু পর্যন্ত ঝুলায়মান এবং ঘাড় লম্বা এমন আকৃতির লোক  
দলপতি হয়।

### ভাগ্যবান পুরুষ

- প্রশস্ত ললাট আর কান লম্বা যায়,  
শাস্ত্র বলে ঐ ব্যক্তির ভাগ্য অপার।
- প্রশস্ত কপাল ও ঝুলায়মান কর্ণধারী ব্যক্তি অত্যন্ত ভাগ্যবান হয়ে থাকে।  
সাদা রং পছন্দ আর জু যুগল জোড়া  
ভদ্র, শান্তিপ্রিয় বুদ্ধিমান ও ধনবান তারা।

## খ) পুরুষ স্বভাব-চরিত্র

### অহংকারী পুরুষ

কথা শেষ করেই যে লোক মুখ বাঁকা করে বা অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ বিকৃত করে  
সে লোক অত্যন্ত অহংকারী হয়ে থাকে।

### ধোকাবাজ লোক

মুখ চ্যাপটা, নাক মোটা, ছোট দু'কান,  
ঐ লোক ধোকাবাজ শাস্ত্রের প্রমাণ।

### গোয়ার গোবিন্দ

যে লোকের হাত ও পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ গদার মত মোটা  
এমন লোক অত্যন্ত গোয়ার প্রকৃতির হয়ে থাকে।

### নিমক হারাম পুরুষ

কৃষকায়, দীর্ঘ তনু মিন্মিনে চায়,  
ওর মত নিমক হারাম এ দুনিয়াতে নাই।

### অপব্যয়ী ব্যক্তি

মাতামহের/নানার চেহারা,  
আকৃতি ও স্বভাব চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত অপব্যয়ী হয়ে থাকে।

### খল প্রকৃতির লোক

যে ব্যক্তি কথা বলার সময় ঘন ঘন জিহ্বা বের করে এবং  
নাচায় ঐ লোক অত্যন্ত খল প্রকৃতির হয়।

স্ত্রী হেতু কষ্ট যার

নাকির পাঁচিলে আঁচিল যার,

স্ত্রীর হাতে কষ্ট ভীষণ তার ।

**মিথ্যুক লোক**

কথায় কথায় যে লোক দিব্য/শপথ করে,

এমন লোক অত্যন্ত মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে ।

**বিয়েতে মেয়ে কষ্ট পায়**

খাবার খেতে যে লোক বড় গ্রাসে খায়,

এমন পাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে নাই ।

**নির্দয়/অত্যাচারী লোক**

লোমহীন বুক ও ঘাড়ে মোটা রগ বিশিষ্ট ব্যক্তি অত্যন্ত নির্দয় হয় ।

রক্তবর্ণ চোখ, মোটা ঘাড়- এমন লোক অত্যাচারী হয়ে থাকে ।

**বিশ্বাসে সর্বনাশ অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক**

কথা শেষে কাশি দেয়, নিচ ঠোঁটে হাসি,

এমন লোককে করলে বিশ্বাস, পড়বে গলে ফাঁসি ।

**দুষ্ট প্রকৃতির লোক**

মুখের ভাষা যার অত্যন্ত মিষ্টি, ক্ষুদ্র চোখ মিন মিন করে তাকায়

এমন ব্যক্তি অত্যন্ত খল বা দুষ্ট প্রকৃতির হয় ।

**ভাগ্যহত লোক**

কপালে হাত রেখে যে লোক ঘুমায়,

ভাগ্যহত এ লোক জানে দুনিয়ায় ।

**বেঈমান লোক**

কথা বলার সময় যে ব্যক্তির স্বরে, কণ্ঠে, ভঙ্গিতে, উচ্চারণে, প্রকাশে ও

আচরণে অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায় নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত ত্রুর নিষ্ঠুর

ও বেঈমান হয়ে থাকে ।

**কামুক লোক**

নাকে তিল এবং লোম ভরা বুক,

জানবে এমন লোক ভীষণ কামুক ।



নিলজ্জ লোক

যে ব্যক্তির লিঙ্গের অগ্রভাগে কালো তিল আছে,  
এমন ব্যক্তি অত্যন্ত নিলজ্জ হয়।

লোচ্চা লোক

ধীরে ধীরে কথা বলে, ঘন ঘন চোখে টিপ মারে,  
লোচ্চর এমন লোক বলে দাও সবারে।

হিংসুক লোক

হাঁটার সময় যে ব্যক্তি একদিকে কাৎ হয় হাঁটে,  
শাস্ত্র বলে এমন লোক অত্যন্ত হিংসুক বটে।

ভাব/বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ ব্যক্তি

কথা বলার সময় চোখ উল্টাইয়া বিকৃত করে, চোখের সাদা অংশ দেখায়ে  
বা চোখেতে টিপ মেরে কথা বলে ঐ রূপ ব্যক্তি একটুতেই রেগে উঠে। এরা  
ক্রুদ্ধ স্বভাবের, এদের সাথে ভাব বা বন্ধুত্ব করা নিষেধ।

নিজেকে বড় মনে করে

কথা বলার সময় বিজ্ঞের ঢঙ্গে ফাসিফুসি করে বলে কিংবা বলে কানে কানে,  
এমন ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বড় বলে জানে।

## ক) নারী স্বভাব-চরিত্র

ভাগ্যবতী নারী

হাসির সময় যে নারীর দাঁত বের না হয়,

সে খুবই সৌভাগ্যবতী হয়।

অধরের ডান দিকে ক্ষুদ্র তিল অতি, (অধর- নিচের ঠোঁট)

সবাই জানে ঐ নারী বড় ভাগ্যবতী।

সতী নারী

ডান পা আগে চলে মৃদু যার গতি,

শাস্ত্র কয় ঐ নারী সীতা সম সতী।

কুলবতী নারী

তিল হয় যে নারীর কর্ণ লতিকায়,

এমন কুলবতী খুঁজে পাওয়া দায়।

সম্মানীয়া নারী

ওষ্ঠের বামেতে তিল যার শোভা পায়,  
লোকে তো মানে সদা, মানে দেবতায় ।

স্বামী সোহাগী নারী

তিল চিহ্ন যে নারীর বামস্তনে রয়,  
ঐ নারী চিরদিন স্বামী সোহাগিনী হয় ।  
ঘামলে নাকের ডগায় মুক্তাদানা ভাসে,  
সোহাগ পেয়ে ঐ নারী স্বামীর কোলে হাসে ।

সুখী নারী

যে নারীর ভুরু বাঁকা ধনুর মতন,  
এমন সুখী কেউ হয়নি কখন ।  
আয়ত নয়ন যার গোলাকৃতি মুখ,  
ঐ নারীর ভাগ্যে লেখা চিরদিন সুখ ।  
দু'ভুরুর মাঝখানে ক্ষুদ্র এক তিল,  
রাজ-রানীর সাথে তার ভাগ্যের মিল ।

## খ) নারী স্বভাব-চরিত্র

ভাগ্যহীনা নারী

পদাঙ্গুলী যার ক্ষুদ্র অতিশয়,  
ভাগ্যহীনা ঐ নারী কোকশাস্ত্রে কয় ।

অসতী নারী

রাগলে যে নারীর কপালে শিরা দেখা যায়,  
ঐ নারী অসতী শাস্ত্রের ভাষায় ।  
যে নারীর রাগ বেশি এবং রাগলে কপালে শিরা ভেসে ওঠে দেখা যায় ঐ  
নারী অসতী হয়ে থাকে ।

অলক্ষুণে নারী

যে নারী নেচে নেচে হেলে দুলে চলে  
এমন নারীকে সবে অলক্ষুণে বলে ।  
চলার সময় যদি দপ্ দপ শব্দ হয়  
এমন নারীকে লোকে অলক্ষুণে কয় ।

**কলংকিনী নারী**

হাঁটতে যে নারী থপ থপ করে চলে,  
কলংকিনী হয় সে কোকশাস্ত্র বলে ।

**লক্ষ্মীছাড়া নারী**

পায়ের গোড়ালী অত্যধিক মোটা, নাক থ্যাবড়ানো  
এবং খাবার সময় মস্ত হা করে খায়  
ঐ নারী অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকে ।

কাঁচা চাল চিবানো যে নারীর স্বভাব  
চিরদিন ঐ ঘরে ছাড়ে না অভাব ।

যে নারীর নাকের ডগা মোটা, মধ্যভাগ নীচু,  
কুলক্ষণা মেয়ে সে, ভাবেনা আগ-পিচু ।

**বংশক্ষয়ী নারী**

হাঁটার সময় যে নারী উড়ায় ধুল,  
শাস্ত্রে কয় বংশক্ষয়ী মজায় সে কুল ।

**বজ্জাত নারী**

কাল ঠোঁট, লাল চোখ, ট্যারাব্যাকা দাঁত,  
শাস্ত্রে কয় ঐ নারী ভীষণ বজ্জাত ।

**কামুকী নারী**

যার চক্রে নয়ন, আর বক্রে চরণ,  
হাজার পুরুষে ঐ নারীর নাহি ভরে মন ।  
কথায় পরাজিত হতে কভু রাজি নয়,  
আহারে পটু এমন নারী কামুক অতিশয় ।  
কথায় নিপুন আর ভোজনে দ্বিগুণ,  
কে নেভাতে পারে তার কামের আগুন ।  
যে মেয়ের চোখ বিড়ালের চোখের ন্যায়,  
প্রচন্ড কামুক সে শাস্ত্রের কথায় ।

**বেহায়া নারী**

মুখ বড় চোখ দুটি ছোট অতিশয়,  
বেহায়া নারী একে কোকশাস্ত্র কয় ।

স্বামী বশকারীনী নারী

হাসতে যে নারীর গালে পড়ে টোল,  
স্বামী থাকে চিরবশ, তার হয়ে পাগল ।

জল্লাদ নারী

ওষ্ঠের উপর প্রান্তে যে নারীর ঘর্মবিন্দু জমা হয়,  
ঐ নারী জল্লাদ প্রকৃতির শাস্ত্রে তা কয় ।

স্বামী খেকো নারী

বর্ষা ফলকের ন্যায় তীক্ষ্ণ যার দাঁত,  
স্বামী খেকো ঐ নারী ঘটে অচিরাৎ ।

ঝগড়াটে নারী

অলম্বিত কেশ, টিয়ার ঠোঁটের ন্যায় ঠোঁট,  
হাঁটার সময় অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে এলোমেলোভাবে হাঁটে  
ঐ ধরণের নারী অত্যন্ত ঝগড়াটে হয় ।  
“চুল খাটো টিয়া ঠুটো, লম্ব দিয়ে চলে,  
ঐ নারী ঝগড়াটে হয়, সব লোকে বলে ।”

হিংসা পরায়ণ নারী

ক্ষুদ্র কান, লম্বা নাক ও দীর্ঘ দু'চরণ,  
এমন নারী অত্যন্ত হিংসা পরায়ণ ।

চোর প্রকৃতির নারী

যে নারীর বাম গালে পাশাপাশি তিল জোড় হয়,  
শাস্ত্র বলে ঐ নারী চোর অতিশয় ।

সতীত্ব হারায়

ভগদেশে যে নারীর কালো তিল আছে,  
সতীত্ব হারায় সে কেঁদে মরে পাছে ।

স্বামীর বিত্ত বেসাত-ক্ষয়ী নারী

চিরুণীর মত ফাঁক ফাঁক দাঁত,  
ক্ষয় করে ঐ নারী স্বামীর বেসাত ।

– চিরুণীর মত (চিরলদন্তী) দাঁত ফাঁক যে নারীর,  
সে স্বামীর বিত্ত বেসাত ক্ষয় করে থাকে ।

কথা বলার কালে যে কপাল কুচায়,  
এমন নারী জীবনে বড় কষ্ট পায় ।

ভাব নিষিদ্ধ নারী/অপয়া নারী

আঙ্গুলী তুলে যে নারী খাবার খায়,

ঐ নারীর সাথে ভাব করতে নাই।

পায়ের তালুতে মাটি স্পর্শ করে না,

খড়মা পা বিশিষ্ট ঐ অপয়া নারী ঘরে এনো না।

জেদী নারী

একটুতেই যে নারীর চোখে বহে নদী,

শাস্ত্রের ভাষায় ঐ নারী অতিশয় জেদী।

প্রতারক নারী

কথায় কথায় কারণে-অকারণে যে নারীর হয় অশ্রুপাত

এমন নারী হয় প্রতারক, করে কুপোকাত।

## জ্যোতিষ বিদ্যায় মানব চরিত্র ও বিয়েতে শুভাশুভ

পৃথিবীতে যখন কোন মানবশিশু জন্মগ্রহণ করে তৎসময়কে ঘিরে লগ্ন নির্ণীত হয়। এ লগ্নের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যোগ-সম্বন্ধ আছে। সৌরজগতে ঘূর্ণয়মান বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে সূর্যের সাথে পৃথিবীর সম্পর্ক অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র সবকটি থেকে বেশী।

সূর্য পৃথিবীর উপর নানাভাবে ক্রিয়া করে। তাই, সূর্যের সাথে আমাদের জীবনের ওতোপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবী তার নিজ মেরুদন্ডের বা অক্ষের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফলে দিন-রাত্রি হয়। সূর্যরশ্মি পৃথিবীর উপর লম্ব বা তির্যকভাবে পতিত হলে এবং পৃথিবীর পরিভ্রমণকালে সূর্যের কাছে আসা বা দূরে চলে যাবার ফলে শীত, গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতু পরিবর্তন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠে অভিকর্ষ শক্তির মধ্যে অবস্থানের কারণে পৃথিবীস্থ মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু, গাছপালাও একই সঙ্গে একই গতিতে আবর্তন করে।

মহাকাশে সর্বমোট ৮৮টি তারকামণ্ডল কল্পনার মধ্যে সূর্যের বার্ষিক আপাত চলার পথ (তারার ভেতর দিয়ে একটা পাক সম্পূর্ণ করে এক বছরে) ধরে অবস্থিত সুবিন্যস্ত

ও বিশেষ পরিচয়যুক্ত মোট বারটি অংশ তথা ১২টি রাশিতে বিভক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, আরো ২৭টি নক্ষত্রকে ভারতীয় জ্যোতিষ বিদ্যার মধ্যে কল্পনা করা হয়েছে। সৌরজগতে নিয়ত ঘূর্ণিমান এসব গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও প্রভাবের উপর পৃথিবীর জীবজগতের ভালমন্দ অনেককিছু নির্ভর করে। গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, গতি ও প্রভাবের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবজগতের শুভাশুভ সম্পর্কে অনেক কিছু জ্যোতিষ বিদ্যার মাধ্যমে জানা যায়।

প্রাচীনকালে আর্ষদের সকল কার্যকলাপ এমন কি তৎসময়ে রাজকার্য প্রণালীও জ্যোতিষশাস্ত্রের মতানুসারে সম্পন্ন হত। জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞানলাভের দ্বারা মানবের স্বাভাবিক মেধা ও কোন বিশেষ জ্ঞানার্জনে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কর্মবৃত্তি, বিয়ে, চরিত্রগত দোষগুণ, উপার্জন, আয়ু প্রভৃতি এবং মানবের শৈশবকাল হতে পরিণত বয়স পর্যন্ত পথের নির্দেশ ও প্রেরণার উৎস বিষয়ে বিশদভাবে জানা যায়।

মানুষ যৌবনে প্রদার্পণ করলে প্রত্যেকে বিপরীত দেহের সঙ্গ কামনা করে। ঐ মানুষটিকে (নর বা নারীকে) ভালবেসে দুটি হৃদয় এক হয়ে একান্তে কাছে পেতে ব্যাকুল হয়। কোন্ নরের সঙ্গে কি ধরণের নারীর সঙ্গ হলে (বিয়ে হলে) দু'জনের জীবন সুখী/অসুখী হয় তৎবিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র নির্দেশনা দিয়েছে। ঐ নির্দেশনা মোতাবেক মানুষের জন্মলগ্ন, নক্ষত্র, রাশি ইত্যাদি নিম্নলিখিত বিষয়াদির ধারণা জন্মালে মানব-চরিত্র সম্পর্কে জানা সহজ হয়।

এ উদ্দেশ্যে গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশকালে কোন্ নর-নারীর সাথে বিয়ে শুভাশুভ তা জানার জন্য ছেলে/মেয়ের জন্ম লগ্ন অর্থাৎ সঠিক জন্মক্ষণ থেকে গণনায় রাশি, নক্ষত্র ইত্যাদি বের করে স্বভাব, চরিত্রগত দোষগুণ বিশ্লেষণের সাধারণ কিছু নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হল।

## রাশি-নক্ষত্র-জন্মলগ্ন-কুটবিচার

মানুষের জন্মমূহর্তে চন্দ্র যে তারায় অঙ্কিত হয়ে চিত্রকক্ষে অবস্থান করে সেই কক্ষের চিত্রের নামে মানুষের রাশির পরিচয় চিরকালের মতো নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। যে তারিখে, যে সময়ে ছেলে বা মেয়ের জন্ম, ডাইরেট্টরী পঞ্জিকায় সে তারিখে জন্ম সময়ে কোন নক্ষত্র এবং সেদিন 'জন্মে' কোন রাশি তা জানা যায়। তাছাড়া, ডাইরেট্টরী পঞ্জিকায় প্রত্যেক মাসের শুরুতে সে মাসের বিভিন্ন তারিখে 'দৈনিক লগ্নারম্ভকাল'

উল্লেখ থাকে। সাধারণভাবে জাতক/জাতিকার জন্ম তারিখ ও সময় অনুসারে-রাশি নক্ষত্র ও কোন লগ্নে জন্ম তা জানা যাবে। অতঃপর সে অনুসারে ছেলে/মেয়ের বিষয়ে গণনা করে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

দ্বাদশ রাশির নাম : ১-মেঘ, ২-বৃষ, ৩-মিথুন, ৪-কর্কট, ৫-সিংহ, ৬-কন্যা, ৭-তুলা, ৮-বৃশ্চিক, ৯-ধনু, ১০-মকর, ১১-কুম্ভ, ১২-মীন।

নক্ষত্রের নাম : ১-অশ্বিনী, ২-ভরণী, ৩-কৃত্তিকা, ৪-রোহিনী, ৫-মৃগশিরা, ৬-আর্দ্রা, ৭-পূর্ণবসু, ৮-পুষ্যা, ৯-অশ্লেষা, ১০-মঘা, ১১-পূর্ব ফল্গুনী, ১২-উত্তর ফল্গুনী, ১৩-হস্তা, ১৪-চিত্রা, ১৫-স্বাতী, ১৬-বিশাখা, ১৭-অনুরাধা, ১৮-জ্যেষ্ঠা, ১৯-মূলা, ২০-পূর্বাষাঢ়া, ২১-উত্তরাষাঢ়া, ২২-অভিজিৎ, ২৩-শ্রবণা, ২৪-ধনিষ্ঠা, ২৫-শতভিষা, ২৬-পূর্বভাদ্রপদ, ২৭-উত্তর ভাদ্রপদ, ২৮-রেবতী।

নক্ষত্র মোট ২৭টি। এ ২৭টি নক্ষত্রই গণনা করা হয়। এ ২৭টি নক্ষত্র ছাড়াও এদের অন্তর্গত 'অভিজিৎ' নামে একটি নক্ষত্র আছে এর চিহ্নক '০'। এ নক্ষত্রটি উত্তরাষাঢ়ার শেষপাদ এবং শ্রবণার আদি চারি দণ্ড নিয়ে সংগঠিত।

মাস : আষাঢ় মাসে হরি শয়নের পর বিয়ে হলে কন্যার দুঃখ কষ্টে দিন কাটে।  
শ্রাবণ মাসে বিয়ে হলে কন্যা মৃতবৎসা হয়।  
ভাদ্র মাসে বিয়ে হলে বেশ্যা হয়।  
আশ্বিন মাসে বিয়ে হলে মৃত্যুযোগ থাকে।  
কার্তিক মাসে বিয়ে হলে রোগাক্রান্ত হয়।  
পৌষ মাসে বিয়ে হলে ভ্রষ্টা, বৈধব্য বরণ করে।  
চৈত্র মাসে বিয়ে হলে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারিণী হয়।

উল্লিখিত মাসাদি ছাড়া মলমাস না থাকলে সে বছর বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের যে কোন শুভ দিনে বিয়েতে দম্পতি সুখী হয়।

বার : সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বিয়ে হলে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী।  
শনি, রবি ও মঙ্গলবারে বিয়ে হলে কুলাটা হয়।

গর্গমুণি বলেছেন- রাত্রিকালের বিয়েতে বার দোষ থাকে না। বিশেষতঃ রবি, মঙ্গল ও শনিবারে বার দোষ হয় না।

তিথি : অমাবশ্যা, বিষ্টিভদ্রা ও রিজ্জা তিথিতে বিয়ে অকাল মৃত্যু, তবে শনিবারে যদি রিজ্জা তিথি থাকে তবে কনে পতিব্রতা ও পুত্রবতী হয়।

নক্ষত্র : রোহিণী, রেবতী, মৃগশিরা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, মূল্য, হস্তা ও স্বাতী ইত্যাদি নক্ষত্রে বিয়ে শুভ । মূল্য নক্ষত্রের প্রথম ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থপাদসহ অন্য সকল নক্ষত্র বিয়েতে বর্জনীয় ।

লগ্ন : মিথুন, কন্যা ও তুলা লগ্নে বিয়ে শুভ । যখন মূণির মতে— ধনুরাশির পূর্বার্ধলগ্নে যদি বিয়ে হয় তবে কনে পতিব্রতা হয় । কোন শুভ লগ্ন না থাকলে সে ক্ষেত্রে গোধূলি লগ্নে বিয়ে ও গোধূলি লগ্নে যাত্রা শুভ হয় । যখন সূর্য অস্তাচলগামী ও পশ্চিম দিকের আকাশ সামান্য লালবর্ণ হয়, গৃহগামী গো-মাহিষাদির পদধূলিতে আকাশ আচ্ছন্ন হয়, সেসাথে আকাশে তারাও দেখা যায় সে সময়ই হচ্ছে ‘গোধূলি লগ্ন’ । যেসব মাসে বিয়ে নিষিদ্ধ নয়, সেসব মাসে গোধূলী লগ্নে বিয়ে শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ । তাছাড়া, শনি এবং বৃহস্পতিবারে গোধূলি লগ্নে বিয়ে নিষেধ ।

পুরুষের অযুগ্ম বছরে রবি, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হলে এবং মেয়ের যুগ্ম বছরে গুরু, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হলে বিয়ে হতে পারে । তবে, যুগ্ম বছরে বিয়েতে কন্যা বিধবা ও অযুগ্মে দুর্ভাগা হয় । অতএব, গর্ভ হতে গণনা করে যুগ্ম বর্ষে বিয়ে হলে কন্যা পতিব্রতা, পুত্রবতী হয় । জন্মমাসাবধি গণনায় অযুগ্ম বর্ষে তিন মাসের পর নয় মাস পর্যন্ত যুগ্ম এবং যুগ্ম বর্ষে তিন মাস পর্যন্ত যুগ্ম এরপর অযুগ্ম বর্ষ হবে ।

যোগ : যোগ ২৭ প্রকার । যথা— ১-বিষ্ণু, ২-শ্রীতি, ২-আয়ুজ্ঞান, ৪-সৌভাগ্য, ৫-শোভন, ৬-অতিগন্ড, ৭-সুকর্মা, ৮-ধৃতি, ৯-শূল, ১০-গন্ড, ১১-বৃদ্ধি, ১২-ঋষ, ১৩-ব্যঘাত, ১৪-হর্ষণ, ১৫-বজ্র, ১৬-অসূক (সিদ্ধি), ১৭-ব্যতীপাত, ১৮-বরীয়ান, ১৯-পরিখ, ২০-শিব, ২১-সিদ্ধ, ২২-সাধ্য, ২৩-শুভ, ২৪-শুক্র (শুক্র), ২৫-ব্রহ্ম, ২৬-ইন্দ্র, ২৭-বৈধৃতি ।

নিম্নেলিখিত যোগ বিয়ে ও অন্যান্য শুভকার্যে পরিতাজ্য ।

যোগ	যোগধিপতি
ব্যতীপাত যোগে বিয়ে হলে কুলচ্ছেদ	শিব
পরিঘ যোগে কন্যা স্বামীঘাতিনী	বিশ্বকর্মা
বৈধৃতিযোগে বিধবা	অদিতি
অতিগন্ডযোগে বিমদঙ্কা	চন্দ্র
ব্যঘাতযোগে ব্যাধি	পবন
হর্ষণযোগে শোকার্ত	রুদ্র
শূলযোগে শূলরোগ ও ব্রণ	সর্প
গন্ডযোগে রোগ ভয়	অগ্নি
বিষ্ণুযোগে সর্পদংশন	যম
ব্রজযোগে মৃত্যু	বরুণ



ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় বিয়ের সময় নির্ঘণ্টে তারিখ, সময়, লগ্ন ও যোগ উল্লেখ থাকে।  
উল্লেখিত যোগভিন্ন অন্যযোগে বিয়ে প্রশস্ত।

বিয়ের পূর্বে ছেলে ও কন্যার পরস্পরের জন্মরাশ্যাদি হতে যে শুভাশুভ বিচার করা হয় তাকে যোটক বিচার বলে। যোটক বিচার আট প্রকার। যথা— ১. বর্ণকুট, ২. বশ্যকুট, ৩. তারাকুট, ৪. যোনিকুট, ৫. গ্রহ মৈত্রীকুট, ৬. গণ মৈত্রীকুট, ৭. রাশিকুট, ৮. ত্রিনাড়ীকুট।

কুট বিচারের পূর্বে ছেলে ও মেয়ের জন্মলগ্ন, নক্ষত্র, বার, রাশি, বর্ণ, যোনি, জন্মমাস ইত্যাদি তথ্য একটি কাগজে লিখে অতঃপর কুটবিচারে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। আট প্রকার কুটবিচার করার পর প্রত্যেকটি কুটবিচারের ফলাফল যোগ করে শুভাশুভ জানা যাবে। রাজযোটক হলে কুটবিচারের প্রয়োজন নেই।

প্রত্যেকটি কুট বিচার সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল :

১. বর্ণকুট : রাশি অনুযায়ী ‘বর্ণকুট’ নির্ণয় হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠবর্ণা কন্যার সাথে হীনবর্ণ পুরুষের বিয়ে হলে অশুভ/মৃত্যু হয়। যেমন— মীন রাশির মেয়ে বিপ্রবর্ণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবর্ণা। অন্যদিকে, মিথুন রাশির ছেলে শুদ্রবর্ণ অর্থাৎ হীনবর্ণ। এমতাবস্থায়, মীন রাশির মেয়ের সাথে মিথুন রাশির ছেলের বিয়ে শুভ নয় অর্থাৎ এরূপ বিয়ে কর্তব্য নয়। কারো জন্ম নক্ষত্র স্থির না থাকলে আদ্যক্ষর নিয়ে গণনা করে (৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা) উভয়ের নক্ষত্রে বেধ হলে সেরূপ ক্ষেত্রে বিয়ে উচিত নয়।

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র বলেছেন—

“পুরুষের বিয়ে নিম্নঘরে,  
উন্নতিতে সমাজ চড়ে,  
উচুর মেয়ে নিলে ঘাড়ে  
বংশ নাশে লক্ষ্মী ছাড়ে।”

ছেলে বা মেয়ের জন্মকালীন সময়ে নক্ষত্রের উপস্থিতি বা উদয়, ঐ জাতকের জন্য তা জন্মনক্ষত্র হিসেবে বিবেচিত। এক একটি নক্ষত্র চারভাগে বিভক্ত। এর এক এক ভাগকে ‘পাদ’ বলে। কোন নক্ষত্রের কোন ‘পাদ’ অংশে জন্মগ্রহণ করলে জাতক/জাতিকা কোন রাশির হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১) অশ্বিনী এবং ভরণীর চারিপাদ ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম এক পাদ = মেঘরাশি।

- ২) কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ,  
রোহিনীর চারিপাদ ও মৃগশিরার প্রথম দু'পাদ = বৃষরাশি ।
- ৩) মৃগশিরার শেষ দু'পাদ, আদ্রার চার পাদ ও  
পূর্ণবসুর প্রথম তিন পাদ = মিথুনরাশি ।
- ৪) পূর্ণবসুর শেষ এক পাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষার চার পাদ = কর্কট রাশি ।
- ৫) মঘা ও পূর্ব ফল্গুনীর চারপাদ ও উত্তরফল্গুনীর প্রথম এক পাদ = সিংহ রাশি ।
- ৬) উত্তর ফল্গুনীর শেষ তিনপাদ, হস্তার চারপাদ ও  
চিত্রার প্রথম দু'পাদ = কন্যা রাশি ।
- ৭) চিত্রার শেষ দু'পাদ, স্বাতীর চারপাদ ও  
বিশাখার প্রথম তিন পাদ = তুলা রাশি ।
- ৮) বিশাখার শেষ এক পাদ, অনুরাধা ও জ্যৈষ্ঠার চারপাদ = বৃশ্চিক রাশি ।
- ৯) মূলার চারপাদ, পূর্বাষাঢ়ার চারপাদ ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথম পাদ = ধনু রাশি ।
- ১০) উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ, শ্রবণার চার পাদ ও  
ধনিষ্ঠার প্রথম দু'পাদ = মকর রাশি ।
- ১১) ধনিষ্ঠার শেষ দু'পাদ, শতভিষার চার পাদ ও  
পূর্বভাদ্রপদের প্রথম তিন পাদ = কুম্ভ রাশি ।
- ১২) পূর্বভাদ্রপদের শেষ এক পাদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও  
রেবতীর চার পাদ = মীন রাশি ।

যাদের জন্ম নক্ষত্র স্থির নেই, তৎ ক্ষেত্রে রাশি অনুসারে নামের আদ্যক্ষর নিয়ে গণনা করে নক্ষত্র স্থির করা যায়।

জন্মরাশি অনুসারে নামের যে রূপ আদ্যক্ষর নির্ণয় হয়—

মেষ রাশি = অ, ল, আ

বৃষ রাশি = ই, এ, ও, উ, ব

মিথুন রাশি = ক, ছ, ঘ, ঙ

কর্কট রাশি = ড, হ

সিংহ রাশি = ম, ট

কন্যা রাশি = প, ঠ

তুলা রাশি = র, ত

বৃশ্চিক রাশি = ন, ষ

ধনু রাশি = ধ, ভ, ফ, ঢ, ড়

মকর রাশি = খ, জ

কুম্ভ রাশি = গ, শ, স

মীন রাশি = চ, দ, থ, ঝ, ঞ

শতপদ চক্রানুসারে নক্ষত্রের প্রতিপাদের আদ্যক্ষর অনুসারে জাতকের নামের আদ্যক্ষর হয়ে থাকে/হওয়া বিধেয়।

নক্ষত্রের চতুর্ভাগবোধক নাম চতুষ্টয়ের আদ্যক্ষর

রাশি অনুসারে নামের আদ্যক্ষর

১ম	২য়	৩য়	৪র্থপাদ	যে নক্ষত্র হবে
চু	চে	চো	ল	১. অশ্বিনী
লি	লু	লে	লো	২. ভরণী
অ	ঈ	উ	এ	৩. কৃত্তিকা
ও	ব	বি	বু	৪. রোহিণী
বে	বো	ক	কি	৫. মৃগশিরা
কু	ঘ	ঙ	ছ	৬. অর্দ্রা
কে	কো	হ	হি	৭. পূর্বফল্গুনী
হু	হে	হো	ড	৮. পুষ্যা
ডি	ডু	ডে	ডো	৯. অশ্লেষা
ম	মি	মু	মে	১০. মঘা
মো	ট	টি	টু	১১. পূর্বফল্গুনী
টে	টো	প	পি	১২. উত্তর ফল্গুনী
পু	শ	ণ	ঠ	১৩. হস্তা
পে	পো	র	রি	১৪. চিত্রা
রু	রে	রো	ত	১৫. স্বাতী

তি	তু	তে	তো	১৬. বিশাখা
ন	নি	নু	নে	১৭. অনুরাধা
নো	ষ	ষি	ষু	১৮. জ্যেষ্ঠা
ষে	ষো	ভ	ভি	১৯. মূলা
ভু	ধ	ফ	ঢ়	২০. পূর্বাষাঢ়া
ভে	ভো	জ	জি	২১. উত্তরাষাঢ়া
জু	জে	জো	খ	০. অভিজিৎ
খি	খু	খে	খো	২২. শ্রবণা
গ	গি	গু	গে	২৩. ধনিষ্ঠা
গো	শ	শি	শু	২৪. শতভিষা
শে	শো	দ	দি	২৫. পূর্ব ভাদ্রপদ
দু	থ	ঝ	ঞ	২৬. উত্তর ভাদ্রপদ
দে	দো	চ	চি	২৭. রেবতী

বর্ণকুট বিচারের সুবিধার্থে কোন রাশির জাতিক/জাতিকা (যে কোন মানুষ) কোন বর্ণের তা জ্যোতিষ মতে/মতান্তরে উল্লেখ করা হল

রাশির নাম	বিপ্র বর্ণ	ঋদ্রিয় বর্ণ	বৈশ্য বর্ণ	শুদ্র বর্ণ
সাধারণত	মীন, কর্কট, বৃশ্চিক	মেঘ, সিংহ, ধনু	বৃষ, কন্যা, মকর	মিথুন, তুলা, কুম্ভ
মতান্তরে	-	সিংহ, তুলা, ধনু	মেঘ, মিথুন, কুম্ভ	বৃষ, কন্যা, মকর

**ফলাফল :**

ছেলে উচ্চবর্ণ অথবা ছেলে ও মেয়ের উভয়ের একই বর্ণ হলে

গুণ বা বর্ণকুট নিরূপণে ফলাফল হবে ----- = ১

ছেলে হীনবর্ণের কন্যা উচ্চ বর্ণের হলে গুণ/বর্ণ কুট

বিচারে ফলাফল হবে ----- = ০ (শূন্য)

কেহ কেহ বলেন তুল্যবর্ণ হলে ফলাফল -----  $\frac{১}{২}$  গুণ হবে।

(আট প্রকার কুট বিচার করে সব নম্বর (গুণ) যোগ করলে সর্বশেষ ফলাফল পাওয়া যাবে। যোটক বিচার ফলাফল ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

## ২. বশ্যকুট :

বারটি রাশিকে মুণিগণ দ্বিপদ, চতুষ্পদ ও পদবিহীন (সরীসৃপ) এ তিন ভাগে নির্দিষ্ট করেছেন।

যেমন- মিথুন, কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও ধনুরাশির পূর্বার্ধ = দ্বিপদরাশি

মেঘ, বৃষ, সিংহরাশি ও ধনুরাশির মেঘার্ধ, মকররাশির পূর্বার্ধ = চতুষ্পদরাশি

কর্কট, বৃশ্চিকরাশি ও মকররাশির শেষার্ধ = পদবিহীন (সরীসৃপ) রাশি

কোন রাশি, কোন রাশির বশ্যরাশি তা লোকাচার বশতঃ নিরূপণ করতে হবে।

যেমন- বৃষরাশির বশ্য মেঘরাশি।

মকর রাশির বশ্য কর্কটরাশি।

সিংহরাশির বশ্যরাশি হচ্ছে- মেঘ, বৃষ, মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, কুম্ভ।

উল্লিখিত নিয়মে যদি কন্যার রাশি বরের বশ্য রাশি হয় তবে এরূপ বিয়ে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিলাভ ঘটে। অন্যরূপ হলে কলহাদি হয়ে থাকে।

## বশ্যকুট বিচার ফলাফল :

ছেলে ও মেয়ের পরস্পর বৈরী বা ভক্ষ্য হলে = ০ গুণ

বশ্য ভক্ষ্য হলে =  $\frac{১}{২}$  গুণ

বৈর ভক্ষ্য হলে = ১ গুণ

পরস্পর সখ্য হলে = ২ গুণ

## ৩. তারাকুট :

ছেলের জন্ম নক্ষত্র থেকে কন্যার জন্ম নক্ষত্র পর্যন্ত যত সংখ্যা, সে সাথে কন্যার জন্ম নক্ষত্র থেকে ছেলের জন্ম নক্ষত্র পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল যা হয় তাকে ৯ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ ০, ১, ২, ৪, ৬, ৮ হয় তবে শুভ এবং ৩, ৫, ৭ থাকলে অশুভ হয়।

## ফলাফল :

ছেলে-মেয়ে উভয়ের তারাশুদ্ধি হলে ৯ নম্বর (গুণ), একজনের তারাশুদ্ধি হলে  $\frac{১}{২}$  গুণ, উভয়ের অশুদ্ধি হলে ০ (শূন্য) গুণ হয়।

৪. যোনিকুট : ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জ্ঞাত হবার জন্য এ বিচার প্রয়োজন। নর-নারীর যোনিকুট বিচার করে উভয়ের ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে জানা যায়।

## রাশি, নক্ষত্র, গণ ও যোনিচক্রে দম্পতির শুভাশুভ বিচার

রাশি	নক্ষত্র	গণ	যোনি
১. মেঘরাশি	১. অশ্বিনী	১. দেব	১. ঘোটক
	২. ভরণী	২. নর	২. হস্তী
	৩. কৃত্তিকা	৩. রাক্ষস	৩. মেষ
২. বৃষরাশি	৩. কৃত্তিকা	৩. রাক্ষস	৩. মেষ
	৪. রোহিনী	৪. নর	৪. সর্প
	৫. মৃগশিরা	৫. দেব	৫. সর্প
৩. মিতুনরাশি	৫. মৃগশিরা	৫. দেব	৫. সর্প
	৬. আর্দ্রা	৬. নর	৬. কুকুর
	৭. পুনর্বসু	৭. দেব	৭. বিড়াল
৪. কর্কটরাশি	৭. পুনর্বসু	৭. দেব	৭. বিড়াল
	৮. পুষ্যা	৮. দেব	৮. মেষ
	৯. অশ্লেষা	৯. রাক্ষস	৯. বিড়াল
৫. সিংহ রাশি	১০. মঘা	১০. রাক্ষস	১০. ইঁদুর
	১১. পূর্বফল্গুনী	১১. নর	১১. ইঁদুর
	১২. উত্তর ফল্গুনী	১২. নর	১২. গো
৬. কন্যারাশি	১২. উত্তর ফল্গুনী	১২. নর	১২. গো
	১৩. হস্তা	১৩. দেব	১৩. মহিষ
	১৪. চিত্রা	১৪. রাক্ষস	১৪. ব্যাঘ্র
৭. তুলারাশি	১৪. চিত্রা	১৪. রাক্ষস	১৪. ব্যাঘ্র
	১৫. স্বাতী	১৫. দেব	১৫. মহিষ
	১৬. বিশাখা	১৬. রাক্ষস	১৬. ব্যাঘ্র

৮. বৃশ্চিকরাশি	১৬. বিশাখা	১৬. রাক্ষস	১৬. ব্যাঘ্র
	১৭. অনুরাধা	১৭. দেব	১৭. হরিণ
	১৮. জ্যেষ্ঠা	১৮. রাক্ষস	১৮. হরিণ
৯. ধনুরাশি	১৯. মূলা	১৯. রাক্ষস	১৯. কুকুর
	২০. পূর্বাষাঢ়া	২০. নর	২০. বানর
	২১. উত্তরাষাঢ়া	২১. নর	২১. নকুল
১০. মকররাশি	২১. উত্তরাষাঢ়া	২১. নর	২১. নকুল
	২২. শ্রবণা	২২. দেব	২২. বানর
	২৩. ধনিষ্ঠা	২৩. রাক্ষস	২৩. সিংহ
১১. কুম্ভরাশি	২৩. ধনিষ্ঠা	২৩. রাক্ষস	২৩. সিংহ
	২৪. শতভিষা	২৪. রাক্ষস	২৪. ঘোটক
	২৫. পূর্বভাদ্রপদ	২৫. নর	২৫. সিংহ
১২. মীনরাশি	২৫. পূর্বভাদ্রপদ	২৫. নর	২৫. সিংহ
	২৬. উত্তর ভাদ্রপদ	২৬. নর	২৬. গো
	২৭. রেবতী	২৭. দেব	২৭. হস্তী

বৈরী যোনিতে অকাল মৃত্যুর আশংকা। বৈরী যোনি সর্বদা বর্জনীয়। যদি কন্যার রাশি ছেলের রাশির বশ্য হয় তবে সেক্ষেত্রে বিয়ে তেমন দোষের হয় না। নিম্নে যোনি বৈরিতা উল্লেখ করা হল—

### যোনি বৈরিতা

গো	↔	ব্যাঘ্র
হস্তী	↔	সিংহ
অশ্ব	↔	মহিষ
কুকুর	↔	হরিণ
নকুল	↔	সর্প
বানর	↔	মেঘ
বিড়াল	↔	ইঁদুর

এছাড়াও, লোকাচার বশতঃ বৈরীযোনি পরিত্যাগ পূর্বক প্রভু ভৃত্যে নক্ষত্রানুসারে শুভাকাঙ্ক্ষিগণ বিয়েতে অগ্রসর হবেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা যাদের বৈরীতা দেখতে পাই সেরূপ বৈরীযোনি সর্বদা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়।

যোনিকুট ফলাফল : মহাদ্বৈরে ০, বৈরে -১, স্বভাবে-২, মৈত্রে-৩ এবং অতিমৈত্রে-৪ গুণ হবে। ছেলে মেয়ে একই যোনি হলে শুভ, ভিন্ন যোনি হলে মধ্যম হয়। বৈরী যোনিতে অত্যন্ত অশুভ বা একের মরণাশঙ্কা সূচিত হয়।

৫. গ্রহ মৈত্রীকুট : ছেলে ও মেয়ের উভয়ের রাশ্যাধিপতিদ্বয়ের অবস্থান মিত্রতা হলে দাম্পত্য জীবনে শুভ, সাম্য/সমতা হলে মধ্যম, শত্রুতা হলে অশুভ হয়।

রাশির অধিপতি গ্রহ এবং কোন গ্রহের সাথে কোন গ্রহের মিত্রতা, সাম্য/সমতা ও শত্রুতা তা নিম্নছকে দেখানো হল-

সিংহ রবে নিজ স্থানম (রবে = রবি)  
 সোমশচ কৰ্কটস্থিত (সোম = চন্দ্র)  
 মেঘ বৃশ্চিক কৈয় ভৌম (ভৌম = মঙ্গল)  
 ধনু মীনে গুরুবাসরে  
 কন্যা মিথুননশচ বুধ  
 শুক্রনশচ বৃষ তুলকে।

রাশির নাম	রাশির অধিপতি গ্রহের নাম	অধিপতি গ্রহের সাথে		
		মিত্রতা	সাম্য/সমতা	শত্রুতা
সিংহ	রবি	চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি	বুধ	শুক্র, শনি
কৰ্কট	চন্দ্র	রবি, বুধ	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি	-
মেঘ, বৃশ্চিক	মঙ্গল	রবি, চন্দ্র, বৃহস্পতি	শুক্র, শনি	বুধ
মিথুন, কন্যা	বুধ	রবি, শুক্র	শনি, মঙ্গল, বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু, মীন	বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	শনি	বুধ, শুক্র
বৃষ, তুলা	শুক্র	বুধ, শনি	মঙ্গল, বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র
মকর, কুম্ভ	শনি	বুধ, শুক্র	বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র
	রাহু	শুক্র, শনি	বুধ, বৃহস্পতি	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল
	কেতু	রবি, চন্দ্র, মঙ্গল	বুধ, বৃহস্পতি	শুক্র, শনি



গ্রহমৈত্রীকুট বিচার ফলাফল = একাধিপতি অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে উভয়ের অধিপতি গ্রহ মিত্রতা হলে = ৫ গুণ, সমমিত্র হলে = ৪, উভয়ের সম হলে ৩, উভয়ের মিত্র বৈরী হলে=১, সম বৈরী হলে ১/২ গুণ এবং পরস্পর শত্রুতা হলে ০ (শূন্য) হয়।

## ৬. গণমৈত্রীকুট :

জাতকভেদে 'গণ' নির্ধারিত হয়। জন্মানক্ষত্র অনুসারে 'গণ' নির্ণয় নিম্নছকে সহজে বোধগম্য হবে। 'গণ' মাত্র তিনটি। যথা- দেবগণ, নরগণ, দেবারিগণ (রাক্ষসগণ)। এছাড়াও যোনিকুট অনুচ্ছেদেও জন্মানক্ষত্র অনুসারে 'গণ' উল্লেখ করা হয়েছে।

ক) দেবগণ = হস্তা, স্বাতী, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা ও পূর্ণবসু নক্ষত্রে যাদের জন্ম।

খ) নরগণ = আর্দ্রা, রোহিণী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া ও পূর্ব ভাদ্রপদ- নক্ষত্রে যাদের জন্ম।

গ) দেবারিগণ (রাক্ষসগণ) = জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, বিশাখা, মূলা, শতভিষা, ধনিষ্ঠা, কৃত্তিকা, চিত্রা ও মঘা নক্ষত্রে যাদের জন্ম।

বিচার : স্ব স্ব গণে বিয়ে শ্রেষ্ঠ। দেবগণ ও নরগণে বিয়ে মধ্যম। দেবগণ ও রাক্ষসগণের বিয়ে অধম। নরগণ ও দেবারিগণের (রাক্ষসগণে) বিয়ে হলে মৃত্যুর আশংকা।

গণমৈত্রীকুট বিচারে ফলাফল = ছেলে ও মেয়ে উভয়ে একই গণ হলে = ৬ গুণ, দেবগণ ও নরগণ হলে ৫ গুণ, মেয়ের দেবগণ এবং ছেলের নরগণ হলে ৪ অথবা ৩ গুণ। ছেলের দেবারিগণ (রাক্ষসগণ) এবং মেয়ের দেবগণ = ২ গুণ। ছেলের জন্মানক্ষত্র দেবারিগণ (রাক্ষসগণ) এবং মেয়ের জন্মানক্ষত্র নরগণে হলে = ১ গুণ হয়। দেব + দেবারি (রাক্ষসগণ) হলে = ০ গুণ। নর+দেবারিগণ (রাক্ষসগণ) হলে = ০ গুণ।

## ৭. রাশিকুট নিরূপন (রাজযোটক) :

ছেলে ও মেয়ের এক রাশি হলে এবং ছেলে ও মেয়ের রাশি সমসংগত (অর্থাৎ বৃষ+বৃশ্চিক, কর্কট+মকর, কন্যা+মীন) বা ৪র্থ (কর্কট) + ১০ম (মকর) বা ৩য় (মিথুন)+১১শ (কুম্ভ) রাশি হলে রাজযোটক হয়। এরূপ বিয়ে শুভ হয়। রাজযোটক

সম্পর্কে প্রশংসা করে শ্রীভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি মুণিগণ বলেন- রাজযোটকে গ্রহ বৈরিতা, তারা অন্তর্দ্বি, গণ, বর্ণ ও নাড়ী দোষ প্রভৃতি কোন দোষ হয় না।

ছেলে ও মেয়ের রাশি বিচারের জন্য 'মিলন চক্র' দেয়া হল-

যার যে রাশি, সে রাশির সংখ্যা হতে গণনায় ৩য়, ৪র্থ, ১০ম ও ১১শ তম রাশি হলে তা রাজযোটক হবে।

যথা- ১. মেষ + ৩. মিথুন	= রাজযোটক
১. মেষ + ৪. কর্কট	= রাজযোটক
১. মেষ + ১০. মকর	= রাজযোটক
১. মেষ + ১১. কুম্ভ	= রাজযোটক
৫. সিংহ + ৭. তুলা	= রাজযোটক
৭. তুলা + ১০. মকর	= রাজযোটক

ছেলে ও মেয়ের রাশি বিচারের জন্য মিলন চক্র -

১	২	৩	৪	৫	৬
রাশির সংক্ষেপ সংকেত	ছেলের রাশি	রাজযোটক (২+৩) মেয়ের রাশি	উত্তম মিলন (২+৪) মেয়ের রাশি	মধ্যম মিলন (২+৫) মেয়ের রাশি	অধম মিলন (২+৬) মেয়ের রাশি
মে	১ মেষ	মে, মি, কর্ক, ম, কু	ধ, মী	বি	বৃ, সিং, ক, তু
বৃ	২ বৃষ	বৃ, কর্ক, সিং, বি, কু, মী	ম, মে	তু	মি, ক, ধ
মি	৩ মিথুন	মি, সিং, ক, মী, মে	কু, বৃ	ম	কর্ক, তু, বি, ধ
কর্ক	৪ কর্কট	কর্ক, ক, তু, ম, মে বৃ	মি, মী	ধ	সিং, বি, কু
সিং	৫ সিংহ	সিং, তু, বি, বৃ, মি	মে, কর্ক	মী	ক, ধ, ম, কু
ক	৬ কন্যা	ক, বি, ধ, মি, কর্ক, মী	বৃ, সিং	কু	ম, তু, মে
তু	৭ তুলা	ম, তু, ধ, কর্ক, সিং	মি, ক	বৃ	মে, বি, কু, মী
বি	৮ বৃশ্চিক	বি, ম, কু, বৃ, সিং, ক	কর্ক, তু	মে	মি, ধ, মী
ধ	৯ ধনু	ধ, কু, তু, ক, মী	সিং, বি	কর্ক	মে, বৃ, মি, ম
ম	১০ মকর	মে, কর্ক, ম, তু, বি, মী	ক, ধ	মি	বৃ, সিং, কু
কু	১১ কুম্ভ	কু, মে, বৃ, বি, ধ	তু, ম	ক	মি, কর্ক, সিং, মী
মী	১২ মীন	মী, বৃ, মি, ক, ধ, ম	কু, বি	সিং	মে, কর্ক, তু

## দ্বাদশ নব পঞ্চক কথন

ছেলের রাশি হতে মেয়ের রাশি দ্বিতীয় হলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী বিভিনাশিনী,  
ছেলের রাশি হতে মেয়ের রাশি পঞ্চম হলে স্ত্রী পুত্রনাশিনী হয়,  
ছেলের রাশি হতে মেয়ের রাশি নবম হলে পতিপ্রিয়া ও পুত্রবতী হয়,  
ছেলের রাশি হতে মেয়ের রাশি দ্বাদশ হলে ধনবিশিষ্টা ও পতিপ্রিয়া হয়।

## বিষম সপ্তম

ছেলে ও মেয়ের রাশি পরস্পর মেঘ ও তুলা,  
মিথুন ও ধনু, সিংহ ও কুম্ভ হয় তাহলে বিষম সপ্তক হয়।  
এরূপ বিয়ে হলে ছেলে মেয়ে উভয়ের মৃত্যু তুল্য ফল হয়।

## মিত্রষড়ষ্টক

ছেলে ও মেয়ের মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও  
মেঘ, কর্কট ও ধনু এরূপ হলে এ বিয়ে শুভ হয়।

## অরিষড়ষ্টক

ছেলে ও মেয়ের রাশি মকর ও সিংহ, কন্যা ও মেঘ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, বৃষ  
ও ধনু, বৃশ্চিক ও মিথুন হলে তা অরিষড়ষ্টক হয়। এরূপ হলে তা মনুষ্য কি  
দেবতাগণও পরিত্যাগ করেন।

মিত্রাদিযোগ হলেও ষড়ষ্টকাদি (মিত্রষড়ষ্টক ও অরিষড়ষ্টক) স্থলে পুরুষের নক্ষত্র  
হতে গণনায় কন্যার বিপৎপত্যরি ও নিধন ক্ষেত্র ত্যাগ করতে হবে। পুরুষ ও  
মেয়ের নক্ষত্র এক হলে কন্যা পতিপরায়না হয়। যদি, ছেলে এবং মেয়ের নক্ষত্র ও  
রাশি একই হয় বা ভিন্ন নক্ষত্র হয়ে এক রাশি হয় তাহলে স্ত্রী ধনপুত্রবতী, সাধ্বী ও  
পতিপ্রিয়া হয়ে থাকে।

## ৮. নাড়ীবেদজ্ঞানম্/ত্রিনাড়ীকুট :

১ অশ্বিনী হতে ২৭ রেবতী পর্যন্ত মোট ২৭ নক্ষত্র বিশিষ্ট একটি ত্রিনাড়ী চক্র অঙ্কন  
করে ছেলে-মেয়ের শুভাশুভ ফল বের করা যায়।

ত্রিনাড়ী অর্থাৎ তিনটি নাড়ী। যথা- ১) পাণ্ডনাড়ী ২) মধ্যনাড়ী ৩) পৃষ্ঠনাড়ী

কোন নাড়ীতে কোন নক্ষত্রের অবস্থান তা'সহ নিম্নে ত্রিনাড়ী চক্র অঙ্কিত হল।

প্রাণনাড়ী	মধ্যনাড়ী	পৃষ্ঠনাড়ী
১- অশ্বিনী	২ ভরণী	৩ কৃত্তিকা
৬- আর্দ্রা	৫ মৃগশিরা	৪ রোহিনী
৭- পূর্ণবসু	৮ পুষ্যা	৯ অশ্লেষা
১২ উত্তরফল্গুনী	১১ পূর্বফল্গুনী	১০ মঘা
১৩ হস্তা	১৪ চিত্রা	১৫ স্বাতী
১৮ জ্যেষ্ঠা	১৭ অনুরাধা	১৬ বিশাখা
১৯ মূলা	২০ পূর্বষাঢ়া	২১ উত্তরষাঢ়া
২৪ শতভিষা	২৩ ধনিষ্ঠা	২২ শ্রবণা
২৫ পূর্বভাদ্রপদ	২৬ উত্তর ভাদ্রপদ	২৭ রেবতী

ছেলে-মেয়ের জন্মনক্ষত্র এক নাড়ীভুক্ত হলে নাড়ীবৈধ হয়। নাড়ীবৈধ দোষে বিয়ে নিষিদ্ধ।

ছেলে-মেয়ের জন্মনক্ষত্র প্রাণনাড়ীভুক্ত হলে এরূপ বিয়েতে স্বামীর মৃত্যু হয়।

মধ্য নাড়ীভুক্ত হলে উভয়ের মৃত্যু হয়।

পৃষ্ঠনাড়ী ভুক্ত হলে স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হয়।

ত্রিনাড়ীকুট বিচার ফলাফল = নাড়ীবৈধ হলে গুণ হবে = ০ (শূন্য) এবং নাড়ীবৈধ না হলে গুণ ৮ হবে।

### যোটক বিচারে ফলাফল

আট প্রকার যোটক বিচারে সর্বমোট প্রাপ্ত ফলাফল অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার যোটক বিচারে যে গুণ বা ফলাফল হয় তা যোগ করে (সর্বমোট) যদি প্রাপ্ত গুণ (ফলাফল) সমষ্টি/ফলাফল (অর্থাৎ আট প্রকার যোটক বিচারে সর্বমোট প্রাপ্ত গুণ (ফলাফল) বা প্রাপ্ত নম্বর) যদি—

১৮ হতে ২০ হয় তবে বিয়ে মধ্যম হয়।

২১ হতে ৩০ হয় তবে বিয়ে শ্রেষ্ঠ হয়।

৩০ হতে ৩৬ হয় তবে বিয়ে শ্রেষ্ঠতর হয়।

উল্লেখ্য, রাজযোটকাদি শুভ হয়।

# বিয়ের প্রকার ও নিয়ম রীতি

১। সনাতন শাস্ত্র মতে- দশবিধ সংস্কারের মধ্যে বিয়ে এক সংস্কার। ব্রহ্মচর্য পালন শেষে যুবক/যুবতীগণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবে এটি সামাজিক/ধর্মীয় কর্তব্য। সকল ধর্ম-কর্ম সস্ত্রীক করার নিয়ম আছে বলে স্ত্রীকে সহধর্মিনী বলা হয়। হিন্দুর বিয়ে কোন চুক্তি নয়। অগ্নি, দেবতা ও গুরুজনদের সাক্ষাতে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য শাস্ত্রীয় মতে অবিচ্ছেদ্যভাবে স্ত্রী গ্রহণ করা হয় বলে স্ত্রীকে অর্ধাসিনীও বলা হয়ে থাকে।

শাস্ত্র মতে পঞ্চবিধ উদ্দেশ্যে বিয়ে হয়। যথা- ক) সহ-ধর্মাচরণ খ) বংশের বৈশিষ্ট্যরক্ষণ। পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্য্যা গ) প্রেম ঘ) সুপ্রজনন ঙ) কামেচ্ছার তৃপ্তি।

২। অতি প্রাচীনকালে হিন্দু সমাজে নিম্নোক্ত আট প্রকার বিয়ে প্রচলিত ছিল।

ক) ব্রাহ্মবিয়ে= বেদজ্ঞ, সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে কন্যা সম্পাদন করাকে ব্রাহ্ম বিয়ে বলা হয়।

খ) দৈববিয়ে= জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলাকালে, যজ্ঞকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যা দান করলে তা দৈব বিয়ে।

গ) আর্ষবিয়ে= কোন ধর্মীয় কার্যে ব্যবহারের জন্য কন্যার পিতাকে এক বা দু'জোড়া গো/মহিষ/বৃষ প্রদান করে কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার নাম আর্ষ বিয়ে।

ঘ) প্রাজাপাত্যবিয়ে= যথারীতি অলংকারাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক, 'তোমরা দু'জন গার্হস্থ্য ধর্ম আচরণ করো'- এ অনুরোধকৃত কন্যাদানকে প্রাজাপাত্য বিয়ে বলে।

ঙ) অসুরবিয়ে= কন্যার পিতা পাত্র পক্ষের নিকট কন্যার মূল্য দাবী করে এবং বিয়েছুক ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্য দিয়ে কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে।

চ) গার্ক্সবিয়ে= যুবক-যুবতী নিজের ইচ্ছাক্রমে পরস্পর অনুরাগ বশতঃ পতি ও পত্নী রূপে গ্রহণ করাই হচ্ছে 'গার্ক্স বিয়ে'। আধুনিক যুগে এ ধরণের বিয়েকে Love marriage বলা হয়। তবে এ বিয়ে শাস্ত্র অনুমোদন করে না।

ছ) রাক্ষস বিয়ে= কন্যাপক্ষ প্রতিকূল হলে, ঐ কন্যা পক্ষের লোকদের হত্যা করে, কন্যা পক্ষ থেকে ছিন্ন করে, তাদের গৃহ ভেদ করে ক্রন্দনরত কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে যে বিয়ে করা হয় তাকে রাক্ষস বিয়ে বলে।

জ) পৈশাচ বিয়ে= প্রাচীনকালে কোন কুমারী কন্যাকে নিদ্রিত অবস্থায় অথবা মাদক দ্রব্য সেবনে অজ্ঞান করে যদি কেউ তাকে ধর্ষণ করত, তবে সে ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হতে পারত। এরূপ বিয়ে অত্যন্ত পাপজনক, নিন্দনীয় এবং অধর্ম।

বর্তমানে অসুর বিয়ে, গার্কব বিয়ে, রাক্ষস বিয়ে, পৈশাচ বিয়ে শাস্ত্র ও সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত নয় (unapproved)।

৩। আইনে সমর্থন থাকলেও একসাথে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণকে সমাজ অত্যন্ত নিন্দা বলে বিবেচনা করে এবং প্রধানতঃ সে কারণেই সমাজে একজন হিন্দুর এক স্ত্রী দেখা যায়।

৪। শিশু বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৮ (১৯৩৮ সালে সংশোধিত) দ্বারা বিয়ে যোগ্য কন্যার বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছর এবং ছেলের বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর ধার্য করা হয়েছে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত আইন আরো সংশোধন করা হয়েছে।

**শাস্ত্রমতে বিয়ে নিষিদ্ধ :**

সনাতন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতে যে সব সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে আইনগত নিষিদ্ধ তা হচ্ছে—

১) বিয়ের পাত্র-পাত্রী একে অণ্যের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, সৎপিতা, সৎমাতা হলে।

২) পাত্রী যদি পাত্রের পূর্বতন ভ্রাতৃবধু, বিমাতা, মাতুলানী, পিতামহী, মাতামহী, পিতামহীর ভ্রাতৃবধু হয়।

৩) যদি পাত্র-পাত্রী, ভাই-বোন, কাকা-ভাইঝি, ভাইপো-কাকীমা ইত্যাদি সম্পর্কযুক্ত হয়। পাত্র-পাত্রী দু'ভাইয়ের বা দু'বোনের বা ভাই-বোনের ছেলে মেয়ে হয়।

৪) সপিভকরণ সম্পর্কের বিয়ে আইনতঃ নিষিদ্ধ এবং গ্রাহ্য নয় যদি না প্রচলিত প্রথায় এ আইন বিয়ে গ্রাহ্য হয়। সপিভকরণ সম্পর্ক বলতে মাতৃকুলের তৃতীয় পর পর বংশধারা এবং পিতৃকুলের পর পর পঞ্চম বংশধারা পর্যন্ত বোঝায়।

**নামে ও গঠনে বিয়ের জন্য কন্যার শুভাশুভ লক্ষণ**

নামে : ধূমবর্ণা অধিকাস্ত্রী অথবা রোগিনী,

অলোমিকা কিংবা হয় অধিক লোমিনী।

বাচাল অথবা হয় পিঙ্গল বরণী,

নক্ষত্র নামিকা কিংবা বৃক্ষের নামিনী ।  
 নদী পক্ষী অহি কিংবা নামে অন্তর্গরি,  
 ভীষণ নামিকা কিংবা দূতীনামধারী ।  
 এসব বিবাহ যোগ্যা কদাচ না হয়,  
 জ্যোতিষ বচন অর্থে এরূপ হয় ।  
 তার মধ্যে বিবাহ কর্তব্যে হবে যেই,  
 জ্যোতিষ প্রমাণ মত লিখিলাম এই ।  
 গঙ্গা কি যমুনা বা গোমতী সরস্বতী,  
 বৃক্ষ নামে যদি হয় তুলসী মালতী ।  
 নক্ষত্র নামেতে হয় রেবতী অশ্বিনী,  
 অথবা রোহিনী হয় অশুভ নাশিনী ।

গঠনে : ট্যারা চক্ষু কিংবা চঞ্চললোচনা,  
 দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গল বরণা ।  
 হাস্যকালে গভস্থলে কুপ হয় যার,  
 বন্ধকী জানিহ তারে কহিলাম সার ।  
 শ্যামাঙ্গী সুকেশী তনু লোমরাজী কান্তা,  
 শুভ্র সুশীলা কিংবা সুশান্তা সুদন্তা ।  
 মধ্যক্ষীণা যদি হয় পঙ্কজ নয়নী,  
 কুলহীনা হলেও বরেষ্টদায়িনী ।  
 কুদন্তা অথবা হয় অধিক ব্যাপিকা,  
 পিঙ্গললোচনা অঙ্গমষ্ঠী সলোমিকা ।  
 মধ্যপুষ্ঠা যদি হয় রাজার বালিকা,  
 কুলে শ্রেষ্ঠা তবু অনিষ্ঠ দায়িকা ।

## সুলক্ষণা সৌভাগ্যবতী নারী

নাম শ্রুতিময় দেখতে সুন্দরী  
 স্বভাবে লাজুক নিঃশব্দ পদচারী ।  
 কোমর সরু অনুন্নত উদর  
 বাহুলোমহীন স্তনদ্বয় গোলাকার ।

সিঙ্ক করতল, স্কন্ধ অবনত সুগঠিত  
মুখ সুগোল তার পিতার মত ।  
মৃদুভাষী কোকিল কণ্ঠি চোখ পদ্মফুল  
অঝোর নয়নে কাঁদে ভ্রমর কালো চুল ।  
উভয় পাটিতে দাঁত ঝকঝকে সমান সুদৃশ যার  
কপাল সমান, মোটা উন্নত ব্রু ধনুকাকার ।  
পাতলা জিহ্বা ঠোট, সরল নাক, হয় পতিপরায়ণ  
মৃদুগামী, পা লোমহীন, এমন মেয়ে সুশ্রী-সুলক্ষণা ।

## রাম সীতার বিয়ে

(সংক্ষেপে বর্ণনা)

[রাম সীতার বিয়ের বর্ণনা- পাঠক্রমে বর্তমানে প্রচলিত বিয়ের সাথে পর্যালোচনায় সুস্বভাবে  
চিত্তার জন্য উপস্থাপিত হল]

জনক রাজার প্রতিজ্ঞা ছিল হরধনু যে ভাঙ্গতে পারবে তাকেই সীতার বিয়ে দেবেন ।  
অনেক রাজা পরাজয়ের পর স্বয়ংবর সভাস্থানে বিশ্বমিত্র মুণিসহ শ্রীরাম ও শ্রীলক্ষণ  
দু'ভাই উপস্থিত হন । শ্রীরামকে দেখে সীতা মোহিত হয়ে দেবগণের নিকট স্বামীরূপে  
প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন । শ্রীরাম ধনুকের গুণ টান দিতেই ধনুক দু টুকরো হয়ে যায় ।  
বিয়ে সাব্যস্ত হয় । অযোধ্যায় বিপুল সাড়া পড়ে । ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ আরম্ভ করেন ।  
দধি, দুগ্ধ, কলা ক্ষীর, ঘৃত, শর্করা সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে ব্রাহ্মণ সীতার অধিবাস  
দিতে মিথিলায় পৌঁছেন । বশিষ্ঠ কুশাসন পাতলেন । ঘট আমপাতা দিয়ে ধান,  
দুর্ব্বার উপর বসানো হল । সোনার সিংহাসনে সীতাকে বসিয়ে বেদমন্ত্র পাঠে সীতার  
ললাটে চন্দন লাগানো হল । বস্ত্র ও অলংকার দ্বারা সীতার অধিবাস হলো ।

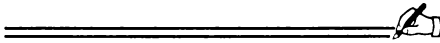
অপরদিকে, মিথিলা হতে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় আসলেন । রামের ক্ষৌরকর্ম ও  
যজ্ঞোপবীত দেয়া হল । দশরথ পুত্রের কপালে চন্দন পরিয়ে দেন । নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ  
করে দান করেন । কৌশল্যা পুত্রকে হরিদ্রা মাখিয়ে দেন । সখীগণ অঙ্গে পিঠালি  
মাখিয়ে তোলা জলে স্নান করিয়ে দেন । বরের হাতে মঙ্গলসূত্র, মাথায় অপূর্ব পাগড়ি,  
বুকে মুক্তাহার, আঙ্গুলে আংটি, হাতে বালা, কানে কুন্ডল দিয়ে দিব্যবস্ত্র পরিয়ে  
দেয় ।



বরযাত্রী মিথিলায় পৌঁছে। রামকে বস্ত্র ও চন্দন দিয়ে বরণ করা হয়। মেয়েরা রামের পায়ে দধি এবং মাথায় ধান দুর্বা দেয়। সীতাকে সাজানো হয় মনোরম সাজে। মাথায় আমলকী দিয়ে তোলা জলে স্নান করিয়ে কেশবিন্যাস চুল বাঁধ হয়। কপালে তিলক আর সিন্দুর, মুক্তার বেসর নাকে, পাটের উড়না দিয়ে শরীর ঢেকে চোখে কাজল, গলায় ঝিলিমিলি হার, বুকে স্বর্ণের কাঁচুলি, হাতে স্বর্ণের তাড়, সোনার কানফুল, হাতে শাঁখা, সোনার কাংকন, পায়ে নুপুর পরিয়ে সুন্দর বস্ত্রে সীতাকে সাজানো হয়।

চারদিকে সোহাগ বাতি জ্বলে। প্রথমে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে সীতা, রামকে নমস্কার করে। সীতা সাতবার রামকে প্রদক্ষিণ করে। শুভ দৃষ্টি হয়। অতঃপর কন্যাকে (সীতা) জলধার দিয়ে অঙ্ককার ঘরে নিয়ে শোয়ানো হয়। সীতাকে ঘষ্টিরূপে পূজা করার জন্য রামকে সখীগণ হাত ধরে আনেন। বন্ধুগণ রামকে বলেন— সীতার হাত ধরে তুলতে হবে। অঙ্ককার ঘরে সীতার চিন্তা-রাম ভুলে সীতার পা ছুঁয়ে বসেন। সীতা বুদ্ধি করে বাম হাত দিয়ে শংখ (শাঁখা) বাজালেন। সীতার অবস্থান বুঝে রাম হাত ধরে সীতাকে তুললেন। বিয়ের পরদিন কনে বিদায়কালে জনক রাজা সীতাকে কোলে নিয়ে চুম্বন করে বললেন— শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করবে। কারো প্রতি রাগ ও হিংসা করবে না। সুখ-দুঃখ চিন্তা না করে কপালে যা আছে তার প্রতি বিশ্বাস রেখো। তবে, স্বামী সেবা কোন সময় ছাড়বে না।

অপরদিকে, অযোধ্যায় কুলবধুরা ও মেয়েরা দরজায় ঘিয়ের বাতি জ্বেলে পূর্ণ স্বর্ণ কলসীর উপরে আম পাতা দিয়ে তার উপরে সুপারি, কলা ও নারকেল রাখে। পথে ছড়িয়ে দেয়া হয় খই, কলা। রাণীগণ বর-বধুকে অলংকার, বসন ইত্যাদি উপহার দেয়। মা ও সকলে বর-বধুকে আশীর্বাদ করে বরণ করেন।



## তথ্যসূত্র

১. মহান বাহাউল্লাহর বাণী হতে।
২. জীবনচর্চা— শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সংসঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত।
৩. যোগপন্থা— সোম প্রকাশ ব্রহ্মচারী
৪. সাধনতত্ত্ব— শ্রীশ্রীমৎ স্বামী গিরিজানন্দ গিরি
৫. ইসলামের স্বাস্থ্যনীতি— ফজল করিম ফারানী
৬. আত্মগঠন, সরল ব্রহ্মচর্য— শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
৭. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাবলী
৮. জ্যোতিষ শিক্ষা— অধ্যাপক ড. রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
৯. ধর্মসূত্র— ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাশয়ের
১০. বিভিন্ন পুস্তিকা— মোঃ সোলেয়মান খোয়াজপুরী